রঙ্গপুর-সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

ত্রয়োদশ ভাগ   ম—৪র্থ সংখ্যা

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী

কাব্য ব্যাকরণতীর্থ, পত্রিকাধ্যক্ষ।

—•—

রঙ্গপুর

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয় হইতে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায়

কাব্যতীর্থ-কবিরঞ্জন সহকারী সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত

(প্রবন্ধের মতামতের জন্য লেখকগণ সম্পূর্ণ দায়ী)

সূচী

কলিকাতা

৯, বিশ্বকোষ-লেন, বাগবাজার,

বিশ্বকোষ প্রেসে

শ্রীহরিচরণ মিত্রদ্বারা মুদ্রিত।

১৩২৫

বার্ষিক মূল্য ৩্ টাকা।]   [ডাকমাশুল ।৵০ আনা।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যগণ বিনামূল্যে ও বিনা ডাকমাশুলে
এই পত্রিকা পাইবেন।

কোনও সদস্যের ঠিকানা পরিবর্ত্তন ঘটিলে অগৌণে জানাইবেন।

নিবেদন

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের পরলোকগত সদস্য নাওডাঙ্গা নিবাসী পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশের নাম রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের সদস্যবৃন্দের অনেকেই অবগত আছেন। সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে পরিষদের অধিকাংশ হিতকর অনুষ্ঠানের সহিত ইঁহার নাম বিজড়িত আছে। ইঁহার সুলিখিত প্রবন্ধরাজি রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার সৌষ্ঠব সম্পাদন করিয়াছে। এতদ্ব্যতীত দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুস্তক ও পুঁথি, মূর্ত্তি ও তাম্রমুদ্রাদি সংগ্রহ দ্বারাও পূর্ণেন্দুবাবু পরিষদের গৌরব-বর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছেন।

সাহিত্য-পরিষদের হিতানুষ্ঠানকল্পে পূর্ণেন্দু বাবু যাহা করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের বিগত ত্রয়োদশ বার্ষিক দ্বিতীয় অধিবেশনে কার্য্যনির্ব্বাহক-সমিতির সদস্য-বৃন্দ পূর্ণেন্দুবাবুর নিঃস্ব পরিবারবর্গের জন্য অর্থ-সংগ্রহ-কল্পে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। আপনি এতদর্থে যাহা কিছু সাহায্য প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ প্রকাশে যথাসম্ভব সত্বর নিম্নলিখিত ঠিকানায় প্রেরণ করিলে বাধিত হইব। অতি ক্ষুদ্র দানও সাদরে গৃহীত হইবে ইতি।

বশংবদ

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী সম্পাদক,

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ।

রঙ্গপুর-পরিষৎ-গ্রন্থাবলী।

৩। গৌড়ের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড। (হিন্দুরাজত্ব)

মালদহের সুযোগ্যপণ্ডিত ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় সঙ্কলিত এই ইতিহাস-গ্রন্থ সভার গ্রন্থাবলীভুক্ত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে। মূল্য কাগজের মলাট ৸০ এবং সুন্দর বাঁধাই করা ১৲ টাকা।

৪। বগুড়ার ইতিহাস। (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড)

শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন বি, এল মহাশয় রচিত এই গ্রন্থে সমগ্র বগুড়ার যাবতীয় বিবরণ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক বিস্তৃতভাবে সঙ্কলিত হইয়াছে। মূল্য ৸০ ও ১।০, এই সভার সদস্যগণের পক্ষে।৵০ ও৷৵০ আনা মাত্র।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ সুলভ মূল্যে বিতরণের বিজ্ঞাপন কভারের চতুর্থপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের দশম সাম্বৎসরিক অধিবেশনে

সভাপতি শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত এম, এ, আই, সি, এস, মহাশয়ের

অভিভাষণ।

যুদ্ধবিগ্রহ সাহিত্যের ঘোর শত্রু, কবিতা-কামিনী বেণুবীণাদির মধুর শব্দের পক্ষপাতিনী—উদ্দাম রণবাদ্য তাঁহার প্রিয় নহে। ভ্রমর-গুঞ্জন, কোকিল-কূজন কবিতাসুন্দরীর কর্ণে মধুবর্ষণ করে—করিবৃংহিত, অশ্বের হ্রেষার কঠোর শব্দ তাঁহার অসহ্য। তরবারির রক্তরঞ্জিত ধারা হইতে দূরে থাকিয়া মসীযোগে লেখনীমুখে আত্মপ্রকাশ তাঁহার অভিপ্রেত। আজ দুই বৎসর যাবৎ ইয়ুরোপে যে ভীষণ সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, তাহার লোলিহান শিখার তাড়নে সুকুমার সাহিত্য ও শিল্প ইয়ুরোপ হইতে অন্তর্হিত হইতে বসিয়াছে। শাণিত উন্মুক্ত কৃপাণ লেখনীর স্থান অধিকার করিয়াছে—তপ্তশোণিত মসীর অনুকল্প—ভূপৃষ্ঠ পত্ররূপে পরিকল্পিত, ইয়ুরোপীয় সাহিত্য বর্ত্তমানে বঙ্গসাহিত্যের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিয়াছে। তাই ইয়ুরোপীয় সাহিত্যের সাময়িক অবনতি আমাদের যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। আসুন, আজ আমরা সমবেত সাহিত্যিকগণ আমাদের অনুষ্ঠেয় কার্য্যের প্রারম্ভে সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি যে, অচিরে ভারত-সম্রাটের ও তাঁহার মিত্র রাজন্যবর্গের বিজয়-গৌরবের সহিত ভীষণ যুদ্ধের অবসান হউক এবং যুগপৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সাহিত্য পরস্পরের হস্তধারণপূর্ব্বক জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করুক।

ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে বঙ্গের মনস্বী কৃতি সুসন্তানগণ বর্ত্তমান সময় হইতে বিংশতি বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের বীজ উপ্ত করেন। ঐ বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বঙ্গের বিদ্বন্মণ্ডলীর অক্লান্ত পরিশ্রমে ও ধনশালী মহাত্মগণের অজস্র অর্থ-বারি-বর্ষণে ধীরে ধীরে স্বীয় কলেবর বৃদ্ধি করিয়া কালক্রমে মহামহীরুহে পরিণত হইয়াছে এবং উহার নয়নাভিরাম পত্রপুষ্পাবলি বঙ্গসন্তানগণের নয়নের অসীম আনন্দ প্রদান করিতেছে।

১৩১২ বঙ্গাব্দে ঐ মহাতরুর একটি শাখা এই রঙ্গপুরক্ষেত্রে প্রোথিত হয়। কুণ্ডীর অন্যতম

ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের অদম্য উৎসাহে, অক্লান্ত পরিশ্রমে ও উত্তরবঙ্গের অন্যান্য সাহিত্যানুরাগী জনগণের সহায়তায় এবং লক্ষ্মীর বরপুত্রগণের আনুকূল্যে রঙ্গপুরের উর্ব্বরক্ষেত্রে রোপিত ক্ষুদ্রশাখা অনতিবিলম্বে পত্র-পুষ্পাদিতে পরিশোভিত হইয়া প্রকাণ্ড বিটপীতে পরিণত হইয়াছে।

এই তরুর সংরক্ষণের ভার প্রথমে রঙ্গপুর-ভূমির নন্দনকাননসদৃশ শ্রীশ্বর্য্যের প্রিয় নিকেতন কাকিনীয়ার প্রজারঞ্জন মহিমারঞ্জনের প্রতি অর্পিত হয়। তিনি ইহার শ্রীসম্পাদন করিতে যথাসাধ্য আয়াস স্বীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু রঙ্গপুরের দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি অকালে মানবলীলা সম্বরণ করায় ইহার পুষ্টিসম্বন্ধে যথেপ্সিত কার্য্য করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার বিয়োগের পর রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ-উদ্যানের উদ্যানপালের কার্য্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরাজ কবিসম্রাট্ শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের প্রতি ন্যস্ত হয়। যিনি সংস্কৃত কাব্যোদ্যানে অপূর্ব্ব সৌরভ "প্রশান্ত-কুসুম" প্রস্ফুটিত করিয়া কুসুমের সৌরভের সহিত নিজের যশঃসৌরভ বিকীর্ণ করিয়াছেন, তাঁহার প্রযত্নে এই উদ্যানে নানাবিধ পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়া দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতেছিল। তৎপর নব নব কিশলয়-শোভিত বৃক্ষরাজির বিবিধ বর্ণের পুষ্পসমূহের উপর "কিরণচন্দ্রের" সর্ব্বাধিক সমুজ্জ্বল কিরণ-প্রপাতে এই উদ্যান স্বতঃই অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল।

দুই বৎসর যাবৎ রঙ্গপুর শাখা সাহিত্য-পরিষদের সভাপতিত্ব আমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে। এই শাখা-পরিষৎ গত একাদশ বৎসরে যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছেন, মুদ্রিত কার্য্যবিবরণ ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। কলিকাতার মূলসভার ন্যায় এই সভারও কার্য্যের প্রসার ক্রমে অত্যন্ত বিস্তৃত করা হইয়াছে। পরিষদের প্রযত্নে বাঙ্গালা ভাষার দিন দিন উন্নতি হইতেছে। বিবিধ বিষয়ের বহুগ্রন্থ প্রচার তাহার নিদর্শন। প্রতি বৎসর অসংখ্য গ্রন্থ লিখিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত সাময়িক পত্র, মাসিক-সাপ্তাহিক-দৈনিক পত্র, নানাপ্রকার বিজ্ঞাপন বঙ্গভাষার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। দর্শন-বিজ্ঞানের গ্রন্থও ক্রমে ক্রমে বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারে উপচিত হইতেছে।

বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষার ন্যায় মার্জ্জিত নহে, হইবার সম্ভাবনাও নাই। বাঙ্গালা ভাষার পদবিন্যাস ও বাক্য-রচনায় শৃঙ্খলা নাই। ব্যাকরণের সূত্রদ্বারা ইহা নিয়মিত করা যায় না। যতটা পারা যায়, গ্রন্থকারগণ ততটাও করিতে ইচ্ছা করেন না। উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ নাই বলিয়া, এবং যাহাও আছে তাহা পড়ার পরিশ্রম কেহ স্বীকার করিতে চাহেন না বলিয়া, গ্রন্থকারগণের যাদৃচ্ছিক রচনার জন্য বাঙ্গালা ভাষার উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল গতি কোনও নিয়মের অধীন নহে। অনেকে মনে করেন, ব্যাকরণের শৃঙ্খলে ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত করিলে ভাষার প্রসার রুদ্ধ হইয়া পড়ে ও সে ভাষা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না। ভাষা আপনার মনে আপনি বর্ষাকালের গিরিনির্ঝরিণীর ন্যায় নিজের পথ নিজে খুঁজিয়া লইবে, অথবা মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বন-জঙ্গল ভেদ করিয়া আপনার পথ আপনি করিয়া চলিয়া যাইবে। কোনও বাধাবিঘ্ন তাহার

গতির প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। ব্যাকরণ তাহার পশ্চাতে তাহার গতি লক্ষ্য করিবার জন্য সশঙ্কভাবে গমন করিবে।

এই উক্তির সারবত্তা সম্বন্ধে আমরা কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। যদি আমরা বাঙ্গালা ভাষাকে উন্নত সভ্যজনোচিত ভাষার স্থান দিতে ইচ্ছা করি, তবে কি তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত না করিয়া তাহাকে যথেচ্ছ চলিয়া যাইতে দেওয়া উচিত? যথেচ্ছাচার উন্নতির পরিচায়ক নহে।

সূক্ষ্মদর্শনের সাহায্যে দেখিলে দেখা যায় যে, গিরিনির্ঝরিণী যথেচ্ছ গমন করিলেও যথেচ্ছাচারিতার মধ্যেও শৃঙ্খলার অভাব নাই। যথেচ্ছাচারিণী তটিনীও মাধ্যাকর্ষণের শক্তি ও জলের নিম্নগামিত্বের বিরুদ্ধে যায় না—যাইতে পারে না।

মত্তমাতঙ্গ যথেচ্ছ গমন করিলেও পর্ব্বতে প্রতিহতগতি হইলে পথ পরিবর্ত্তন করে। বৃক্ষ সম্মুখে পড়িলে তাহা ভগ্ন করিয়া চলিয়া যায়, ইহাতে তাহার সামর্থ্য আছে; কিন্তু গিরিবরের শরীর বিদীর্ণ করিতে পারে না, সেখানে সে গতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। যদি না করে, উন্মত্ত হইয়া নগরাজের দেহে করাঘাত করিতে থাকে। তাহা হইলে তাহার গন্তব্য পথ পরিষ্কৃত হয় না; পক্ষান্তরে সে বিপন্ন হয় ও তাহার গজগমন রুদ্ধ হইয়া যায়। ভাষাসম্বন্ধেও এই নিয়ম। ভাষা নিজের পথ নিজে দেখিয়া চলিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রকৃতি অনুসারে পথ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এখানেও যথেচ্ছাচার চলে না। যথেচ্ছাচার কোথাও চলিতে পারে না। যথেচ্ছাচারের ফল বিনাশ। জলচর যদি স্থলে বিচরণ করিতে চায় ও খেচর যদি জলে ক্রীড়া করিতে বাসনা করে, তাহার ফল উভয়ের বিনাশ।

মনোগত ভাব ব্যক্ত করার জন্য ভাষা, কিন্তু সভ্যজনের ভাষায় মনোগত ভাব প্রকাশ ব্যতীত আরও কিছু চমৎকারিত্ব থাকা উচিত। শীত নিবারণের জন্য গাত্রাবরণের আবশ্যক। অসভ্য বর্ব্বর মৃগয়ালব্ধ বন্য পশুর চর্ম্ম গাত্রাবরণরূপে ব্যবহার করে; কিন্তু সুসভ্য মানব কার্পাস-কৌষেয়াদি বিবিধ বস্ত্র নানাপ্রকার কারুকার্য্য-ভূষিত করিয়া প্রাকাররূপে ব্যবহার করিয়া লোকলোচনের বিস্ময় উৎপাদন করে। লৌকিক প্রয়োজন নির্ব্বাহের অতিরিক্ত চমৎকারিত্বই সভ্যজনের সূক্ষ্মশিল্পের বিশেষত্ব।

সূক্ষ্মশিল্পের যে অংশ আপাতদৃষ্টিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হয় না, তাহারও উপযোগিতা ও আবশ্যকতা আছে। সূক্ষ্মশিল্পের অপূর্ব্ব কৌশল চিত্তের বিকাশ সম্পাদন করে। চিত্ত স্বভাবতঃই শিল্পের চমৎকারিত্বে প্রফুল্ল হয়। সভ্যজনের ভাষাতেও এই প্রকারে প্রচলিত কার্য্যোপযোগী মনোভাব প্রকাশোপযোগিত্ব ব্যতীত চিত্তের অপূর্ব্ব বিকাশ-সম্পাদনযোগ্যতা আছে। ভাষার এই অংশই শিক্ষনীয়, ইহাই ভাষার সূক্ষ্ম শিল্প। ইতরজনও পরস্পর মনোভাবের আদানপ্রদান করে। কিন্তু তাহাতে সভ্যজনোচিত সূক্ষ্মভাবের অভিব্যক্তি থাকে না।

প্রচলিত ভাষাকে নিয়ন্ত্রিত না করিলে ঐ সমুদয় সূক্ষ্মভাব প্রকাশের সুযোগ হয় না।

ইতর জন কারক-সমাসের বিশ্লেষণ জানে না। কোনও প্রকারে মনের ভাব মূল শব্দগুলির দ্বারা প্রকাশ করে। শিশুর ভাষা অজ্ঞজনের ভাষার ন্যায়। শিশু যখন প্রথমে বাক্য উচ্চারণ করে, তখন প্রায়শঃই বিভক্তিশূন্য শব্দ উচ্চারণ করে। বিশেষ্যপদ ও ক্রিয়াপদমাত্র ব্যবহার করে, বিভক্তির ব্যবহার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না ও ব্যবহারকালে স্মরণও করিতে পারে না। যথা 'মার কাছে যাইব' এত কথা না বলিয়া "মা যাব", এই মাত্র বলে।

শিশুর অজ্ঞতা অসভ্যের ভাষায় দৃষ্ট হয়। শিশু যেমন 'মা' ও 'যাব' এই দুইটি প্রধান পদ বলে, কিন্তু 'মাতার' ও 'যাওয়ার' নৈকট্যরূপসম্বন্ধ স্থাপন করিতে সম্বন্ধবাচক একটি পদের প্রয়োজন তাহা বুঝিতে পারে না, বুঝিতে পারিলেও ভাষায় অভিব্যক্ত করার সামর্থ্য থাকে না, অসভ্যও তদ্রূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাবগুলি বোঝে না, বুঝিলেও ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না। এই সমুদয় সূক্ষ্ম ভাবাভিব্যক্তির জন্য শব্দশাস্ত্রের শিক্ষার আবশ্যক।

সংস্কৃতভাষা কত সূক্ষ্মভাব প্রকাশে অধিকারী, তাহা সংস্কৃত ব্যাকরণ ও আনুষঙ্গিক শব্দ-শক্তি-প্রকাশিকা, প্রথমা ব্যুৎপত্তিবাদ, দ্বিতীয়াদি ব্যুৎপত্তিবাদ, ভাষাপরিচ্ছেদ ইত্যাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে সম্যগ্‌রূপে বুঝা যায় না। একটি বাক্যকে তদ্ধিত ও সমাসের সাহায্যে সংক্ষিপ্ত করা যায়, আবার সংক্ষিপ্ত বাক্যকে বিস্তৃত করা যায়। শ্লেষ প্রভৃতি অলঙ্কারের সাহায্যে ভাষার যে চমৎকারিত্ব হয়, তাহা পণ্ডিতগণের অবিদিত নহে। ব্যাকরণ ও শব্দ-শাস্ত্রের অন্যান্য গ্রন্থ না জানিলে এই সকল বিষয়ে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব।

বাঙ্গালাভাষায় কতিপয় ক্রিয়াপদ ও বিভক্তি ব্যতীত প্রায় সমুদয়ই সংস্কৃত শব্দ-শাসনের অধীন। এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিলে বাঙ্গালায় পাণ্ডিত্য জন্মিতে পারে না। বাঙ্গালী বাঙ্গালা লিখিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধরূপে লিখিতে হইলে ব্যাকরণ পড়া আবশ্যক।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ভাষার পরে ব্যাকরণ জন্মে, সুতরাং ব্যাকরণ পড়িয়া রচনা করিতে হয় না; প্রধান প্রধান লেখকের লেখা দেখিয়া বৈয়াকরণ ব্যাকরণ প্রস্তুত করেন। একথা কতক অংশে সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও ব্যাকরণ পাঠ হইতে অব্যাহতি নাই। সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ প্রস্তুত আছে। এক্ষণে বাঙ্গালা ভাষার অবয়ব যদি সংস্কৃত হয়, তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ না পড়িয়া উদ্ধার কৈ? বাঙ্গালা ভাষার অবয়ব হইতে সংস্কৃত তুলিয়া দিলে আর বাঙ্গালা ভাষার অস্তিত্ব থাকে কৈ? ব্যাকরণ না পড়িয়া পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের লেখা দেখিয়া লিখিতে গেলে ভ্রম অবশ্যম্ভাবী। প্রসিদ্ধ লেখকের "মনোদুঃখ" দেখিয়া ব্যাকরণানভিজ্ঞ লেখক যে "মনোকষ্টে" পতিত হইবেন ইহা নিঃসন্দিগ্ধ।

এই সমুদয় লেখক অনেক সময় বলিয়া থাকেন যে, সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে "মনোকষ্ট" পদ অসাধু হয় হউক। সংস্কৃতে 'মনঃকষ্ট' বলিতে হয় বল। বাঙ্গালায় 'মনোকষ্ট' বলিতে বাধা দিবার কি আছে? অত ব্যাকরণের বাঁধাবাঁধির মধ্যে গেলে ভাষার উন্নতি অসম্ভব। আর মনোকষ্ট বলিলে দোষ কি?

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোনও প্রকারে মনের ভাব ব্যক্ত করা ইতরজনের ভাষার বিষয় হইলেও বিদ্বজ্জনের ভাষায় সূক্ষ্মশিল্পের ন্যায় বিশেষত্ব থাকা উচিত।

সংস্কৃত সন্ধির সূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'মনোদুঃখ' কেন অনুমত ও 'মনোকষ্ট' কেন প্রতিষিদ্ধ। দুইটি বর্ণের সন্ধি হয়, ইহার মূলে যে তত্ত্ব আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া সন্ধির সূত্র রচিত হইয়াছে। সকল বস্তু সকল বস্তুর সহিত মিলিত হয় না। তৈলের সহিত জলের মিশ্রণ হয় না। এই প্রকার সকল বর্ণ সকল বর্ণের সহিত মিলিত হয় না। ঐ প্রকার মিলনে শব্দ সুশ্রাব্য হয় না। চিত্র-বিদ্যায় বর্ণ-বিন্যাসের শৃঙ্খলা আছে। যে কোনও বর্ণের পার্শ্বে যে কোনও বর্ণ শোভা পায় না। সঙ্গীতশাস্ত্রে স্বরনিয়ম আছে। পদ-সম্বন্ধেও সেই প্রকার যে কোনও শব্দের পার্শ্বে যে কোনও বর্ণ শোভা পায় না।

মনোদুঃখ, মনোগত, মনোরথ ইত্যাদি স্থলে বিসর্গের স্থানে 'উ' হয়; 'উ' পরে 'ও' হইয়াছে। 'ও' গুরুবর্ণ, তৎপরে ঘোষবান্ বর্ণ গ, ঘ, জ, দ ইত্যাদি থাকিলে উচ্চারণের বন্ধন শ্লথ হয় না; কিন্তু এই প্রকার গুরু ও'কারের পর ক প্রভৃতি অঘোষবর্ণ দিলে উচ্চারণের শিথিল বন্ধন জন্য সুশ্রাব্য হয় না। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা এ প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে।

সংস্কৃতে যেখানে যে প্রকার সন্ধির বিধান হইয়াছে, তদনুসারে সন্ধিবন্ধন হওয়া উচিত। সমাস, তদ্ধিত প্রভৃতির দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সংস্কৃতবহুল বাঙ্গালা ভাষার গঠন-প্রণালী সুস্পষ্টরূপে জানিতে হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য ব্যতীত হওয়া সম্ভবপর নহে। বাঙ্গালা ব্যাকরণ লিখিতে গেলেও অনেকাংশে সংস্কৃতেরই অনুসরণ করিতে হইবে। সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন না করিলেও বাঙ্গালায় একখানি ব্যাকরণ পড়া উচিত। ব্যাকরণের অননুমত অশুদ্ধ-প্রয়োগসংযুক্ত বাঙ্গালা কখনই সভাজন পরিগৃহীত হওয়া উচিত নহে। যাঁহারা বাঙ্গালায় গ্রন্থ লিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সংস্কৃত সাহিত্য ও ব্যাকরণে ব্যুৎপন্ন হওয়া উচিত।

অনন্যসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি নিজ প্রতিভাবলে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারও প্রথমে ভাষা শিক্ষা করা উচিত। অনেকে বলিতে পারেন যে, সংস্কৃতে যথেষ্ট পারদর্শী নহেন, এ প্রকার অনেক লোক বাঙ্গালার সাহিত্য-ভাণ্ডারে যে সকল উপঢৌকন দিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃই অমূল্য। ইহা সত্য; কিন্তু ঐ সকল উপঢৌকন যদি সম্পূর্ণ দোষশূন্য হয়, তবেই প্রকৃত আনন্দের বিষয় হয়। এজন্য বাঙ্গালা ভাষায় একখানি সুন্দর ব্যাকরণ প্রস্তুত হওয়া উচিত ও লেখকগণের উহা পাঠ করা উচিত। অবশ্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক প্রাচীন বয়সে ব্যাকরণ পাঠের আয়াস স্বীকার করিবেন না; কিন্তু সম্প্রতি যখন কলিকাতার বিশ্ববিদ্যালয় বাঙ্গালা ভাষার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয় যদি বিদ্যালয়ে উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রচলন করেন তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী লেখকগণ মধ্যে ক্রমে ব্যাকরণের প্রসার বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে। পক্ষান্তরে বিশ্ব-বিদ্যালয় যদি সংস্কৃত শিক্ষার ব্যবস্থার উন্নতি করেন, তাহা হইলেও বিশুদ্ধ বাঙ্গালা প্রচলনের উপায় হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতিবিধানের উপায় ব্যাকরণ-পাঠের সুব্যবস্থা করা। এ সম্বন্ধে শাখা-পরিষৎ এবং মূলসভা অনুরোধ করিলে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সুফল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

সাহিত্য-পরিষদের কার্য্যক্ষেত্রের কেন্দ্র কি ও কি পরিমাণ ব্যাসার্দ্ধ লইয়া তাহার পরিধি অঙ্কিত হওয়া উচিত, তাহা স্থিরীকৃত হওয়া আবশ্যক। অনিয়ত অসীম কার্য্যক্ষেত্রে কার্য্যপরিচালন কোনও স্থলেই শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হয় না। আমার মনে হয়, পরিষদের কার্য্যক্ষেত্র এখন সুন্দররূপে চিহ্নিত নহে। পরিষৎ যে সমুদয় কার্য্য করিতেছেন, তাহার সমুদয়ই অনবদ্য ও প্রশংসার্হ, কিন্তু লক্ষ্যহীন উদ্দেশ্যবিহীন অসমাপ্ত বা সমাপ্তকল্প বহু উত্তম কার্য্যও প্রশংসনীয় নহে; পক্ষান্তরে সঙ্কল্পের অনুকূল সুসমাপ্ত সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন স্বল্প কার্য্যও শ্রেয়স্কর।

পরিষদের কার্য্যাবলী ও গ্রন্থাবলী হইতে আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে পরিষৎ নিজের জীবনের লক্ষ্য কি স্থির করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। মূলসভার জীবনেরই বা লক্ষ্য কি, তাহাও সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। পরিষদের সদস্যগণ স্বকীয় ঔদার্য্যে আমাকে তাঁহাদিগের সভাপতিত্বের গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন। আমিও সসম্মানে তাঁহাদের প্রদত্ত পদ স্বীকার করিয়া পূর্ব্ব-নির্দ্দেশ ক্রমে অগ্রসর হইতেছি।

জগৎ বিচিত্রতাময়—মনুষ্য-জীবনও বহুবিধ ঘটনাপূর্ণ—যে মানব জগতে অবিনশ্বর কীর্ত্তি-স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার জীবনে অশেষবিধ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়; কিন্তু সর্ব্বত্রই বিচিত্রতার মধ্যে একটি একতানতা আছে ও থাকা আবশ্যক।

পরিষদের কার্য্যের প্রধান লক্ষ্য স্থির করিয়া যাহাতে সঙ্কল্প সিদ্ধ হয়—তাহার জন্য চেষ্টা করা উচিত। মূল লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বৃথা আড়ম্বরের বৃদ্ধি উন্নতির পরিচায়ক নহে। পরিষদের উদ্যোগে যে সমুদয় অধিবেশন বা সম্মিলন হইয়া থাকে, তাহার বাহ্যাড়ম্বর দিন দিন অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। আড়ম্বরের তুলনায় প্রকৃত কার্য্য হয় কি না, এ বিষয়ে অনেকেই বোধ হয় সন্দিহান। প্রকৃত সারস্বত-ব্রত বাহ্যাড়ম্বরের সুদূরে অবস্থিত। প্রাচীনতম কাল হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই, সকল দেশে, সকল সময়ে সরস্বতীর প্রিয়পুত্র অনাড়ম্বরে স্বীয় ব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন। অরণ্যের জীর্ণ পর্ণ-কুটীরে তাল-তাড়িতের অকিঞ্চিৎকর পত্রে বংশদণ্ড যে সমুদয় অমূল্যতত্ত্ব উৎকীর্ণ করিয়াছিল, তাহার তুলনা কোথায়? প্রকৃত সাধকের উপাস্য-দেবের মন্দিরের ও উপাসনা সামগ্রীর বাহ্যাড়ম্বর থাকে না। সাধকের ও সাধনার উন্নতির সহিত আপাত-চাকচিক্যময় বাহিরের জাঁকজমক ক্রমেই কমিয়া আইসে ও উন্নতির উচ্চতম সোপানে আরূঢ় সাধকবরের হৃদয় উপাস্যদেবের মন্দিরের স্থান গ্রহণ করে। তখন সাধক আরাধ্য দেবতাকে ভক্তিপুষ্প-উপহারে যে পূজা প্রদান করেন, বাহ্যপূজা তাহার তুলনায় অধম হইতেও অধম। সারস্বত সেবাব্রত-ধারী পরিষদেরও ক্রমে বাহ্যাড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া সারস্বত-সাধনার উচ্চতম সোপানে আরোহণ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; কিন্তু আমার বোধ হয়, আমরা ক্রমে আড়ম্বর পরিত্যাগ

করিয়া প্রকৃত সাধনার দিকে অগ্রসর না হইয়া, বাহ্যাড়ম্বরের মাত্রা ক্রমেই বৃদ্ধি করিতেছি। সাধারণ জনগণের চিত্ত আকর্ষণ করিবার জন্য ও তাহাদিগের হৃদয়কে দেবতার অভিমুখীন করার জন্য সময় সময় আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় সত্য, কিন্তু সকল শ্রেণীর সাধক সকল সময়ে কেবল আড়ম্বরে ব্যাপৃত থাকিলে, তাহা কাহারই কল্যাণের বিষয় হয় না।

পরিষদের পুরাতনানুরাগ প্রশংসনীয় বটে; কিন্তু উপযোগিতার বিচার না করিয়া পুরাতন পক্ষপাত কল্যাণদায়ক নহে। জ্ঞানের উৎকর্ষ আমাদিগের লক্ষ্য হওয়া উচিত। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারিত হইতেছে, তন্মধ্যে যে সকল উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, তাহার প্রতি একেবারে উদাসীন থাকিয়া কেবল পুরাতন অনুসন্ধান আমাদিগের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। কবি যথার্থই বলিয়াছেন—

পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্ব্বং
ন চাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যং
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ় পর প্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ।

পুরাতন কাব্যাদির অনুসন্ধান ও তাহার প্রচারকার্য্য বাঞ্ছনীয় হইলেও ঐ সমুদয় গ্রন্থ বিশিষ্টরূপে পরীক্ষা করিয়া মুদ্রিত করা কর্ত্তব্য। পরিষৎ যে সমুদয় গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন ও তাহাতে যত অর্থ ও পণ্ডিতগণের যত সময় ব্যয়িত হইয়াছে, সেই অনুপাতে বঙ্গের সাহিত্য-ভাণ্ডারে যথেষ্ট উপচয় হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। পুরাতন গ্রন্থ প্রচারিত করিবার পূর্ব্বে দেখা উচিত যে, এমন কি সত্য বা এমন কি ভাব বা রচনা-পারিপাট্য তাহাতে আছে, যাহা আধুনিক প্রচারিত কাব্যাদিতে দুর্লভ। নচেৎ কেবল পুরাতন বলিয়া গ্রন্থ প্রচারিত করিলে সে গ্রন্থের সম্যক আদর হয় না। পরিষৎ পুরাতন পক্ষপাতী হইয়া পুরাতন হইতে পুরাতনতম গ্রন্থ প্রচার করিলেও তাহাতে যদি উপভোগ যোগ্য কিছু না থাকে, অথবা আধুনিক গ্রন্থে তদপেক্ষা অধিক আনন্দদায়ক ও উপদেশমূলক বস্তু-নিচয় থাকে, তবে পরিষদের সহস্র অনুরোধেও কেহই ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে উৎসুক হইবে না। পাঠক না থাকিলে গ্রন্থপ্রচার শ্রোতৃহীন সভায় বক্তৃতার ন্যায় বিড়ম্বনা মাত্র। অনেকে বলেন, প্রাচীনতম গ্রন্থাদি প্রচারিত হইয়া থাকুক। যে মহাপুরুষ বঙ্গের বা ভারতবর্ষের অথবা পৃথিবীর ইতিহাস লিখিবেন, তাঁহার ঐ সকল গ্রন্থের প্রয়োজন হইবে। এই প্রকার অসংখ্য গ্রন্থ প্রচার করিয়া রাখিলে এই সমুদয় গ্রন্থ হইতে সারসংগ্রহ করা সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর ভিন্ন কোনও ব্যক্তিবিশেষ মহাপুরুষের পক্ষে সম্ভব হইবে না। কেহ কেহ মনে করেন, প্রাচীনকালে যে সকল কবি কাব্যাদি লিখিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল কাব্যাদির মুদ্রণ ও প্রচার দ্বারা তাঁহাদের স্মৃতিরক্ষা করা পরিষদের অন্যতর কর্ত্তব্য। ঐ সমুদয় পুস্তক মুদ্রণের অভাবে লুপ্ত হইতে বসিয়াছে। এই প্রকার তাঁহারা মনে করেন; কিন্তু আমাদের মনে হয়, উপযুক্ততার অভাবই তাহাদিগের বিলোপ-সাধন করিয়াছে ও করিতেছে। অনুপযুক্ত গ্রন্থের বহুসংখ্যা প্রচারিত হইলেও তাহা রক্ষা

হইবে না। রামায়ণ, মহাভারত, মাঘ, ভারবি, নৈষধ, কাদম্বরী, শকুন্তলা, মুদ্রারাক্ষস, মৃচ্ছকটিক প্রভৃতি গ্রন্থ যে সময়ে রচিত হইয়াছে, তখন মুদ্রাযন্ত্র ছিল না। অথবা পরিষদের ন্যায় কোনও সমিতি ইহাদিগের রক্ষার ভার গ্রহণ করেন নাই। ইহারা নিজের উপযোগিতায় স্বকীয় অলৌকিক চমৎকারাতিশয্যে দেশ হইতে বিদেশে নিজের প্রভাব বিস্তার করিয়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করিয়াছে। বর্ত্তমান প্রণালীর মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হইবার, কত যুগ-যুগান্ত পূর্ব্বে তমসা নদীর তীরে জটা-চীরধারী কবির মুখ হইতে

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

এই বাণী নির্গত হইয়াছিল; মুদ্রাযন্ত্র ইহাকে সে দিন ধরিয়াছে। তাহার পূর্ব্বের সহস্র সহস্র বৎসর কে ইহাকে রক্ষা করিয়াছিল? ইহার পূর্ব্বে ও পরে কত সহস্র সহস্র কবিতার উদ্ভব হইয়াছে ও তাহা কয়েকদিন শব্দায়মান হইয়া স্বীয় কারণে লীন হইয়া গিয়াছে, কে তাহার অনুসন্ধান লইয়াছে? উপযোগিতা দ্বারা আত্মরক্ষা করিতে না পারিলে কাহারও রক্ষা-বিধান অসম্ভব। "Survival of the fittest" বাণী সাহিত্যক্ষেত্রেও অপ্রযোজ্য নহে। যোগ্যতম স্বকীয় যোগ্যতাবলে আত্মরক্ষা করিবে। তৎসম্বন্ধে প্রযত্ন করিলে তাহা সফল হয়। অযোগ্যের রক্ষার শ্রম পণ্ডশ্রমমাত্র। আমার বিবেচনায় গ্রন্থপ্রচার সম্বন্ধে পরিষদের এই নীতি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

পুরাতন শিলালিপির অনুসন্ধান, তাম্রফলকের আবিষ্কার, ভগ্নাবশিষ্ট স্তম্ভ-তোরণাদির উৎকীর্ণলিপির সংগ্রহ, বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রাসংগ্রহ, তাহাদিগের পাঠোদ্ধার ও প্রচার, নানাযুগের বিবিধ মূর্ত্তিসংগ্রহ, সেই সমুদয় মূর্ত্তির বিবরণ প্রকাশ, নানা স্থানের নানামূর্ত্তির, বিবিধ মুদ্রার, ছায়াচিত্র গ্রহণ ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যে পরিষৎ ব্যাপৃত। এতদ্ব্যতীত সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, আয়ুর্ব্বেদ, ধনুর্ব্বেদ, গান্ধর্ব্ববেদ, পাকবিদ্যা ইত্যাদি প্রবন্ধ রচনা ও প্রচার, ইংরাজী ভাষায় প্রচলিত বৈজ্ঞানিক শব্দসমূহের বঙ্গভাষায় পারিভাষিক শব্দ প্রণয়ন ইত্যাদি কার্য্যেও পরিষদের যথেষ্ট আগ্রহ ও উৎসাহ। এ সমুদয় কার্য্যই প্রশংসনীয় বটে; কিন্তু এই প্রকার অশেষবিধ ব্যাপারে ক্রমে স্বীয় কার্য্যক্ষেত্র বিস্তীর্ণ করিয়া সর্ব্বত্র পরিষৎ উপযুক্তরূপ সুফল উৎপন্ন করিতে পারিতেছেন কি না, অথবা পারিবেন কি না, তাহা চিন্তা করা উচিত।

পরিষদের প্রযত্নে ক্রমে বহু পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে ও হইতেছে। এবং সেই সমুদয় পুস্তক দিব্য আবরণে আবৃত হইয়া পরিষদের পুস্তকাগারের কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। পরিষদের সভ্যগণ স্বীয় কর্ত্তব্য-পালনের অনুরোধে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতেছেন—পরিষৎ-কার্য্যালয় প্রাপ্তিমাত্রে সংগ্রাহক সদস্যদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া পুস্তকের গর্ভে কি আছে তাহা বিচার করিবার সুযোগ-অবসর না লইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া পুস্তকাগারে স্থাপন করিতেছেন, এবং সংগৃহীত পুস্তকের সংখ্যাধিক্যে পরিষদের কার্য্যের সফলতায় পরিমাণ করিতেছেন।

সংখ্যাধিক্য সকল সময় উপকারক না হইয়া বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া থাকে। উপযোগিতাশূন্য বহু পুস্তকের নির্ঘণ্টপত্র প্রণয়ন, তাহাদের সংরক্ষণ ও তাহাদিগের বাসভবন প্রস্তুত করিতে যে অর্থ ও শ্রম ব্যয়িত হয়, তাহা অধিকতর উপযোগী কোনও কার্য্যে ব্যয়িত হইলে অধিক সুফল প্রদান করে কি না, তাহা বিবেচনার বিষয়ীভূত হওয়া কর্ত্তব্য। পুস্তকসংগ্রহের কার্য্য প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু গ্রন্থাগারের কলেবর শোথ রোগীর ন্যায় স্ফীত না করিয়া সারগর্ভ উপভোগ্য গ্রন্থ দ্বারা যাহাতে প্রকৃতরূপ হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহার বিধান করা কর্ত্তব্য। অনুপাদেয়, অনুপযোগী পুস্তকাবলি প্রথমেই যাহাতে পরিত্যক্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা হওয়া উচিত। নচেৎ কালক্রমে এই প্রকার অযত্নসংন্যস্ত অসংখ্য পুস্তকাবলির মধ্যে কাচকাঞ্চনের ভেদ করা অসম্ভব হইবে।

উপযোগিতার বিচার না করিয়া সংগৃহীত রাশীকৃত প্রস্তরফলকাদিও অকারণ পরিষৎভবনে যথেষ্ট স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে ও কালক্রমে অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত বস্তুর অনায়াস-প্রাপ্তির অন্তরায় হইবে। এ স্থলেও পরিষদের যথেষ্ট সতর্কতার সহিত প্রস্তর খণ্ডাদি সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য।

সাহিত্য-পরিষত্তরু বঙ্গভূমির পরম আদরের বস্তু তাহাতে সন্দেহ নাই। এই তরু সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত হইলে ইহার সুশীতল ছায়ায় উপবেশন করিয়া বঙ্গসন্তানগণ যথেষ্ট আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবেন; কিন্তু কেবল সুশীতল ছায়া উপভোগ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। পরিষৎ সকলকেই ইহার ছায়া উপভোগ করার নিমিত্ত আহ্বান করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য জীবনে কঠোর শ্রম করিতে হয়, শীতাতপ যাঁহাদিগের চিরসহচর, তাহাদিগের পক্ষে পরিষত্তরুর সুশীতল ছায়া উপভোগ করা সম্ভবপর নহে। জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য যাঁহাদিগকে কোনও প্রকার বিড়ম্বিত হইতে হয় না, যাঁহারা ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, তাহাদের পক্ষে এই ছায়া উপভোগ অধিকতর শোভা পায়; কিন্তু কার্য্যতঃ অনেক সময় আমরা দেখিতে পাই যে, যাঁহার পক্ষে এই ছায়া উপভোগ সম্ভবপর, তিনি তাহা করেন না; কিন্তু যাঁহার পক্ষে উহা সম্ভবপর নহে, তিনি অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং ছায়াতে আসিয়া উপবেশন করেন, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতে পারেন না।

কবি চন্দনবৃক্ষ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পরিষত্তরুসম্বন্ধে তাহা প্রযোজ্য।

সৌরভৈঃ কতি ন বাসিতা দিশঃ
ছায়য়া কতি ন তর্পিতা জনাঃ
কো ভবন্তমপহাতুমিচ্ছতি
ক্ষুচ্চেন্নবাতি চন্দনদ্রুম।

হে চন্দনবৃক্ষ, তুমি সৌরভ দ্বারা কত দিক্ না আমোদিত করিয়াছ? ছায়া দ্বারা কত লোককে না তৃপ্ত করিয়াছ? কে তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিত—ক্ষুধা যদি না লাগিত?

চন্দন বৃক্ষে ক্ষুন্নিবারণোপযোগী ফল না থাকায় ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তি সৌরভ ও ছায়া উপভোগের জন্য থাকিতে পারেন না। উদর পূর্ণ থাকিলে চন্দনবৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া সৌরভ উপভোগ করা পরম সুখের বিষয়। পরিষত্তরুও আহারীয় সংস্থানের বিধান করিতে পারিলে কেহ তাহার ছায়া ও সৌরভ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিত না।

বর্ত্তমানকালের কঠোর জীবন-সংগ্রামের সময়ে সকল দেশেই সুকুমার সাহিত্যচর্চ্চা ক্ষীণ-প্রভ হইতেছে। ভারতবর্ষে অথবা বঙ্গদেশে সেই নিয়মের বিপর্য্যয় হইবার কারণ নাই। তথাপি পরিষদের সুকুমার সাহিত্য-চর্চ্চা ও প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি কার্য্যে লোকের অনুরাগ বর্দ্ধিত করার চেষ্টা প্রশংসনীয়। উপসংহারে পরিষৎ মহাতরুর শ্রীবৃদ্ধির কামনা করিয়া আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিতেছি।

হেগেলের দার্শনিক মতবাদ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

ফ্রেডেরিক হেগেল উনবিংশ শতাব্দীর একজন জর্ম্মাণ দার্শনিক। পাশ্চাত্যজ্ঞান-জগতের মহাসমন্বয়াচার্য্যরূপে তিনি সর্ব্বত্র বিদিত। তিনি প্রথমে ধর্ম্মযাজকতাকার্য্যের উপযোগী শিক্ষালাভ করেন, এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে নানাদেশীয় নানা সম্প্রদায়ের ভাবনিচয় গ্রহণ করিবার পর তৎকালীন বিখ্যাত দার্শনিকদিগের মতবাদসমূহের আলোচনা করেন। মানব চিন্তার ইতিহাসে ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্রমবিকাশ, তিনি অতিশয় গাঢ় অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিয়াছিলেন।

হেগেলের জন্মকাল, ফরাসী ও জার্ম্মাণ দেশে নব জ্ঞানোদয়ের যুগ: কান্তের সমালোচনা-বাদের (Criticism) প্রভাবে দার্শনিক চিন্তার রাজ্যে তখন এক মহাবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। এই কান্তের সঙ্গে হেগেলের সম্বন্ধ আমরা ক্রমে বুঝিতে চেষ্টা করিব।

যে সকল সমস্যার মীমাংসা হেগেল অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে প্রথম, মানবের স্বাতন্ত্র্য আছে কি না, দ্বিতীয়, মানব জীবনে লৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিভাগের মধ্যে কোনও ঐক্য আছে কি না?

প্রথমটির উত্তর তিনি রুসো, লুথার, কান্ত, ফিক্তে প্রভৃতি পূর্ব্বতন দার্শনিকদিগের চিন্তারাশির মধ্যে পান। প্রাচীন গ্রীসের রাজনৈতিক জীবন তাঁহার দ্বিতীয় প্রশ্নের মীমাংসার সহায়তা করে। মনুষ্যের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে বড়ই পার্থক্য আছে বলিয়া বোধ হয়। এতদুভয়ের সমন্বয়-চেষ্টা হইতেই হেগেলের প্রতিভা বিকাশ পায়। এই সমন্বয় সাধনের জন্য বিভিন্ন জাতির জ্ঞানভাণ্ডার হইতে নানা চিন্তা ও মত সংগ্রহ করিয়া

তিনি তাহাদের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান করেন। এইরূপে বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বই তাঁহার দর্শনের মূলমন্ত্র।

খৃষ্টধর্ম্মসংস্কারক লুথার বলিয়াছেন,—মানবের নিজ জীবন নিয়মিত করিবার পক্ষে স্বীয় বিবেকের অনুশাসনই যথেষ্ট। বাহ্যনিয়মের নিগড় মানবের স্বাধীন বিকাশের অন্তরায়। সামাজিক এবং প্রাকৃতিক নিয়মাবলী, আর মানবের বিবেকের অনুশাসন, উভয়ের মধ্যে চির-বিরোধ। লুথার যে শুধু মানব ও ভগবানের মধ্যবর্ত্তী চার্চ্চ নামক তৃতীয় বস্তুর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিয়াছেন, তাহা নয়, মানবের উপরে বাহিরের কোনও শক্তিরই প্রভাব অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভগবত্তত্ত্বও যখন অন্তরের অনুভূতিসাপেক্ষ, তখন অনুভূতি ব্যতীত কোনও বিষয়ের প্রামাণ্য সিদ্ধ হয় না। লুথারের সংস্কারকাল হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-জগতে স্বাধীনতার অভ্যুদয়। তিনি মানব স্বাধীনতার দুন্দুভি-নিনাদে প্রতীচ্যজাতি সমূহের সুপ্তিঘোর ভঙ্গ করিয়া, তাহাদিগকে অনন্ত উন্নতিপথযাত্রী করিয়াছিলেন। তবে "এই বিবেকের বাণী শুনিয়া চলিতে হইবে" এই মূলমন্ত্র, শিশু ও বর্ব্বরের পক্ষে প্রযোজ্য নহে। আর অবিকশিত মনে স্বভাবতঃ যে বাসনারাশির উদয় হয়, তাহা বিবেকের বাণী নহে। ধর্ম্ম-যাজকদিগের সহিত বিতণ্ডায় ব্যাপৃত স্বাধীন চিন্তাবাদিগণ এই সত্য ভুলিয়া গিয়া কিছু গোল করিয়াছেন। শিক্ষা ও সাধনা দ্বারা বিশুদ্ধ চিত্তে যে নির্ম্মল বিবেকের উদয় হয়, তাহার স্থলে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাভাবিক বাসনানিচয় দান করিলে জগতে বিষম অরাজকতা ও বিপ্লব উপস্থিত হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি ? এই অসংস্কৃত ও অনিয়ন্ত্রিত মানবকে স্বাধীনতা দিতে গিয়া সে যুগের সাহিত্যিকগণ মানবকে যেমন একদিকে ভগবানের আসনে বসাইয়াছিল, অপর দিকে স্বাভাবিক বাসনারাশিকে প্রশ্রয় দিয়া, তাহার পশুভাবে অবনতির পথও সুগম করিয়াছিল। যে যুগ উদার বিশ্বপ্রাণতা, নরসেবা ও জ্ঞানোন্মেষে সমুজ্জ্বল, সেই যুগই আবার জড়বাদ, ব্যষ্টির প্রাধান্য ও সংশয়বাদের অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। লুথারপ্রদত্ত স্বাধীনতার বলে মানব সমাজ ও ধর্ম্মের শৃঙ্খল ছিন্ন করিল। তাঁহার মতে, বাক্য মাত্র নির্দ্দেশ্য এক ধারণাতীত ভগবানে বিশ্বাস ও মানব জাতির ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসই ধর্ম্ম ও সমাজের মূলমন্ত্র হইল। এইরূপ অত্যুদার ও ব্যাপক ভাবের দোষ এই-যে, ইহা কার্য্যোপযোগী বিশেষত্ববর্জ্জিত। ধারণাতীত ভগবান মানবের বৃত্তি সমুদায়কে সংযত রাখিবার পক্ষে যথেষ্ট নহেন। সুতরাং ব্যবহারোপযোগী ধর্ম্মের অভাবে মানুষ ক্রমে পশুতে পরিণত হইতে চলিল।

রুসো ও কান্ত নিজ নিজ ভাবে সমাজনীতি গড়িতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন ; কিন্তু উভয়েরই ভাব বস্তুতন্ত্র না হওয়াতে মানবের ব্যবহারোপযোগী হয় নাই। যদি মানবের দাঁড়াইবার একটি সাধারণ ভূমি না থাকে, তবে পরস্পরের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নির্ণয় হয় না—সকলেই নিজ নিজ মতের প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট হইয়া বিপ্লবের সৃষ্টি করে। রুসো বলিলেন, ইচ্ছা ও বিবেক সমস্ত মানুষেরই এক। এই ঐক্যই মানবের মিলনক্ষেত্র। এই এক যে বিভিন্ন হইয়াই সমগ্র মানবসমাজকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, রুসো তাহা ধরিতে পারেন নাই।

কান্ত বলেন, আত্মবোধের একত্বই (Unity of apperception) সমস্ত মানবের পক্ষে সাধারণ মিলনভূমি। কিন্তু এই মিলনভূমিতে আসিয়া, সকলে না মিলিয়া, বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও কিরূপে লোকে পরস্পরের ঐক্য অনুভব করিতে পারে, কান্ত তাহার মীমাংসা করেন নাই।

এই বিরোধের মধ্যে ঐক্যই হেগেলের দর্শনের ভিত্তি।

কান্তের দর্শনই প্রত্যক্ষভাবে হেগেলের উপজীব্য। কান্ত বলেন, দেশ, কাল প্রভৃতির মন হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইহারা মনের বস্তুজ্ঞান গ্রহণের বৃত্তি। জ্ঞান নিরপেক্ষস্বরূপ বস্তু (Thing-in-itself) সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়। সেই অজ্ঞেয় বস্তুকে আমরা দেশ, কাল, রূপ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি এবং গুণ, পরিমাণ, সম্বন্ধরূপ মনোবৃত্তি বিভাগগুলি (Categories) দ্বারা রঞ্জিত করিয়া, এই দৃশ্য জগতের সৃষ্টি করিয়াছি। একদিকে আত্মা, অপর দিকে বস্তু, এই উভয়ের স্বরূপ অজ্ঞেয়; এবং উভয়ের মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই। আর সমস্ত জগৎ ও মানসিক-ব্যাপার, দেশ, কাল, নিমিত্ত প্রভৃতি মনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও এই দুয়ের মধ্যবর্ত্তী।

কান্তের প্রথম ভুল এই যে, তিনি জ্ঞান-নিরপেক্ষ স্বরূপবস্তু এবং জ্ঞানকেন্দ্র আত্মার মধ্যে এরূপ বিষম বিরোধ কল্পনা করিয়াছেন যে, উভয়ের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ বা সমন্বয় স্থাপন করা যায় না। দ্বিতীয় ভুল এই যে, তিনি দেশ কাল নিমিত্তের অধীন বাহ্য জগৎ ও দেশ কাল নিমিত্তের অতীত আত্মা এই উভয়ের মধ্যেও ঐকান্তিক বিরোধ দর্শন করিয়াছেন। সমস্ত জগৎ যদি এক অনতিক্রম্য নিয়মের শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকে, তবে মানুষের কোনই স্বাধীনতা থাকে না, আর স্বাধীনতা না থাকিলে তাঁহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করাও চলে না। কাজেই কান্ত বলিতেছেন, আত্মা দেশ কাল নিমিত্তের অতীত, অবিনাশী। আত্মা নিজের সীমার মধ্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখন নিয়ম নিগড়বদ্ধ দৃশ্যমান্ জগতের কার্য্যসমূহ এবং নিয়মাতীত স্বতন্ত্র আত্মার কার্য্যসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য কি করিয়া রক্ষা হইবে? ভগবান্ এই সামঞ্জস্যের বিধাতা। প্রাকৃত জগতের সত্তা ব্যবহারিক মাত্র, অপ্রাকৃত আত্ম-রাজ্যেরই একমাত্র পারমার্থিক সত্তা আছে। কিন্তু প্রাকৃত জগতই আমাদের একমাত্র জ্ঞেয়, আত্ম জগৎ শুধু বিশ্বাসের বস্তু। বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভাবতন্ত্র (Subjective), বস্তুতন্ত্র (Objective) নহে। কান্তের এই খানে জ্ঞান ও বিশ্বাসে বিরোধ।

(ব্যবহারিক বিরোধ সত্বেও আত্মাই যে প্রকৃতির সার-সত্য, স্বাধীনতাই যে নিয়ম বন্ধনের সার সত্য এবং অদৃশ্য জগদতীত যাহা তাহাই যে দৃশ্য জগতের সার-সত্য, ইহা কান্ত প্রত্যক্ষ ভাবে না বলিলেও, তাঁহার শেষ জীবনে ইঙ্গিত করিয়াছেন। হেগেল সেই ইঙ্গিত অনুসারে চলিয়া, এই সত্যগুলিকে যুক্তির সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করিয়াছেন।)

কান্তের শিষ্য ফিক্টে প্রকৃতিকে অবাস্তব বলিয়াছেন; তাঁহার মতে আত্মাতিরিক্ত পদার্থ নাই। সেই আত্মা আপনাকে জানিবার জন্যই আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া কল্পনা করেন।

কারণ সীমা (Limit or Condition)-নির্দ্দেশ ব্যতীত জ্ঞান সম্ভবপর হয় না। আত্মার এই স্বকল্পিত সীমাই আত্মারূপে প্রকাশিত। অনাত্ম জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যখন আত্মা নিজেকে জানিবার জন্য এইরূপে আপনাকে সীমাবদ্ধ করিয়া ল'ন, তখনও তাঁহার স্বরূপগত অনন্তত্ব এই অনাত্মারূপ গণ্ডীর ধ্বংস-সাধন প্রয়াসরূপে প্রকাশিত হয়। এই গণ্ডী অতিক্রম করিয়া আত্মা স্বরূপ উপলব্ধির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করে, কিন্তু সে অবস্থা লাভ তাহার ঘটিয়া উঠে না। গণ্ডীটি সরিয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে অপসারিত হইতে পারে না। কারণ জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যে ভেদ না থাকিলে সম্ভবপর হয় না। যতক্ষণ এই ভেদ, ততক্ষণই জ্ঞান বর্ত্তমান। সুতরাং সেই অখণ্ড, সীমাহীন আত্মার স্বরূপে কোনও রূপ ভেদ না থাকাতে সে অবস্থায় কোনও জ্ঞানও থাকে না। ফিক্তের আত্মা এইরূপে মায়ার গণ্ডীতে বদ্ধ হইয়া আর বাহির হইবার পথ খুঁজিয়া পান নাই। ব্যবহারিক জগৎ তাঁহার কল্পনাতে বড়ই অবাস্তব ও ছায়াময় হইয়া পড়িয়াছে। হেগেলের সমসাময়িক বিখ্যাত জর্ম্মাণ-দার্শনিক সেলিং ফিক্তের একদেশদর্শীতা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন, আত্মা ছাড়া জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব নাই বলা ঠিক্ নয়, জগৎ ছাড়া আত্মারই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ"। জড়-জগৎ, ও মনোজগৎ এক আত্মারই বিকাশ। ফিক্তের প্রতিবাদ করিতে গিয়া তাঁহার নিজের মত একদেশদর্শী হইয়া পড়িল। আত্মা ও অনাত্মার বিবাদ মিটাইতে গিয়া তিনি এক তৃতীয় পদার্থকে (Substance) মধ্যস্থ মানিলেন। এই পদার্থ নিরপেক্ষভাবে আত্মা ও অনাত্মারূপে প্রকাশ পায়, কিন্তু সাম্যাবস্থায় প্রকাশিত হয় না, বৈষম্য বা ভেদ হইতেই প্রকাশ। সাংখ্যকারের এই মত অতীব যুক্তিযুক্ত। যেখানে শুধু ঐক্য ও সাম্য, ভেদ সেখানে লুপ্ত।

সেলিংএর অহমিত্ত এই বৈষম্যের অতীত, সুতরাং জ্ঞানের অতীত স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ রহিত অপূর্ব্ব পদার্থ। ইহাকে নব্য প্লাটোনিক Ecstasy বা সমাধি, কিম্বা বৈদান্তিক অপরোক্ষানুভূতি ব্যতীত জানা সম্ভবপর হয় না। সেলিং কিছু কাল ইহাকে জ্ঞাতৃ-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়াছিলেন। সেই কালে হেগেল তাঁহার মতের সমর্থন করেন। পরে যখন সেলিং উহার জ্ঞাতৃত্ব ভুলিয়া উহাকে পদার্থ মাত্র বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, তখন কান্তের যুক্তির সাহায্যে, হেগেল সেলিং এর মত-খণ্ডনে ব্যাপৃত হইলেন। পারমার্থিক সত্তা (Absolute Being) শুধু সত্তা নহে—উহা চেতন-সত্তা। যে "একং সৎ" সমস্ত জগতের পরম কারণ, এবং যাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই, জগদ্ব্যাপারের চরম মীমাংসা সম্ভবপর, তিনি আত্মা (Unity of Subject and Object)। তাঁহার মধ্যে জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়ের একত্ব বিদ্যমান্।

হেগেল দেখিলেন, অনাত্ম প্রকৃতি ও অপ্রাকৃত আত্মার মধ্যে আপাত দৃষ্টিতে বৈষম্য থাকিলেও প্রাকৃত ও আধ্যাত্মিক জগত যে এক, ইহা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। "বিভিন্নতা" যে "ঐক্যেরই" প্রকাশ, সেই "একই" যে এই "বহু" ভাবে প্রকাশ পায়, তাহা প্রমাণ করা কর্ত্তব্য। স্বাধীন আত্মার বাসস্থান যে কোনও ধারণাতীত অবাস্তব রাজ্যে নহে, তিনি যে এই নিয়ম নিগড়াবদ্ধ

প্রকৃতি-রাজ্যেই স্বাধীনভাবে বিরাজিত, তাহা তিনি প্রমাণ করা সঙ্গত মনে করিলেন। এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি এতাবৎকাল প্রচলিত যুক্তি শাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি আরও বলিলেন, বুদ্ধি (Reason) বলেই কি অধ্যাত্ম, কি প্রাকৃত সমস্ত জগতের সমস্যা মীমাংসিত হইতে পারে। কান্ত নির্দ্ধারিত আত্ম-বোধই (Unity of self-consciousness) যে জগতের মূল-সত্য এবং ইহাকে অবলম্বন করিয়াই যে জগৎ-সমস্যার মীমাংসা সম্ভবপর, হেগেল তাহা দেখাইতে চাহিলেন।

আত্মবোধ

পূর্ব্বে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে কান্তের একাত্মবোধ (Unity of self-consciousness) বেদান্তিক আত্মবোধ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বেদান্তের আত্মবোধ অর্থ এই যে শুধু নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্ত স্বভাব, অখণ্ড ও অপরিবর্ত্তনীয় আত্মাই আছেন, আর কিছুই নাই। হেগেলের আত্মবোধ অর্থ, আমি (Ego) এই জগৎ প্রপঞ্চের জ্ঞাতা, এইরূপ জ্ঞান। এই আত্মবোধ সমস্ত জ্ঞানের অন্তর্নিহিত। আমার বস্তু প্রত্যয়রূপ কার্য্যের দ্বারাই আমাকে আমি জানিতে পারি। এই কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে চাহিলে আর আমাকে আমি খুঁজিয়া পাই না। আত্মাকে জানা যায় না এরূপও বলা যায়, কারণ নিখিল জ্ঞানের মূলে ইনি, আবার জ্ঞাতারূপেই ইঁহাকে জানা যায়, ইঁহার জ্ঞাতৃত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব অবিভাজ্যরূপে বিদ্যমান্। ইঁহাকে শুদ্ধ জ্ঞাতা বলিলেও ভুল হইবে, শুদ্ধ জ্ঞেয় বলিলেও ভুল হইবে, ইনি একাধারে উভয়ই। আর সমস্ত জিনিষের অস্তিত্ব ইঁহার জন্য। কিন্তু ইঁহার অস্তিত্ব শুধু নিজেরই জন্য। সুতরাং অনেকে বলিতে পারেন যে, নিরপেক্ষভাবে ইঁহার নিজেকে জানা বড়ই দুরূহ। এই স্থানে হেগেলের আপত্তি এই যে, আত্মাকে জানিবার জন্য যখন আত্মা নিজেই যথেষ্ট, তখন আমাদের আত্মজ্ঞান লাভের অসুবিধা হইবে কেন? সূর্য্য যেমন নিজের আলোকে জগৎ প্রকাশ করে এবং নিজেও প্রকাশিত হয়—সূর্য্য দর্শনের জন্য যেমন লণ্ঠনের প্রয়োজন হয় না, জ্ঞান-স্বরূপ আত্মাই আত্মাকে জানিবার পক্ষে যথেষ্ট। জ্ঞান বলিতে বুঝি, জ্ঞাতার সহিত জ্ঞেয়ের সম্বন্ধ, জ্ঞাতৃজ্ঞেয় সম্বন্ধ, যত নিকট হইবে, জ্ঞানও ততই পরিস্ফুট হইবে, আর জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় যেখানে অভেদ, সেখানেই জ্ঞান সর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জ্বল।

হেগেলের ন্যায়

সমস্ত জগতই বুদ্ধির দ্বারা জ্ঞেয়, এই ধারণা গ্রীক্ দার্শনিক অ্যারিষ্টটলের সময় হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। হেগেল তাঁহার ন্যায়শাস্ত্রে এই বুদ্ধির বিকাশ-প্রণালী বর্ণনা করিয়াছেন। হেগেলের মতানুসারে এই বুদ্ধি বা বোধই স্বরূপ-বস্তু (Thing-in-itself)। সুতরাং এই বুদ্ধির বিকাশ-প্রণালীর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টিতত্ত্বেরও ব্যাখ্যাকার্য্য সাধিত হইতেছে। বুদ্ধি শুধু জাগতিক বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞানের কারণ নহে, ইহাই জাগতিক বস্তু সমূহের সৃষ্টির কারণ। সুতরাং হেগেলের মতে যে ন্যায়শাস্ত্র বুদ্ধিরূপ সৃষ্টির মূলতত্ত্বের বিকাশ-প্রণালী বর্ণনা করিয়াছে, তাহাই দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অঙ্গ।

জ্ঞান-প্রণালী বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সত্তা (Being) বা অস্তিত্ব বোধই বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাবের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপক। কোনও কিছু সম্বন্ধ-জ্ঞান হইতে হইলে "উহা আছে", এই জ্ঞানই সর্ব্বপ্রথম উদিত হইয়া থাকে, কিন্তু গুণ ও পরিমাণ শূন্য শুদ্ধ অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানবের ধারণা কখনও পরিস্ফুট হইতে পারে না। অস্তিত্ব জ্ঞান সমস্ত জ্ঞানের মূলে, কিন্তু গুণ, পরিমাণ, কার্য্য ইত্যাদি অস্তিত্বের যত প্রকার ভেদ হইতে থাকে, ততই অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান স্ফুটতর হইতে থাকে। আমাদের যত প্রকার জ্ঞান আছে, তাহা অস্তিত্ব জ্ঞানেরই প্রকারভেদ মাত্র। প্রকার বিহীন অনির্দ্দিষ্ট অসীম অস্তিত্বকে অনস্তিত্ব বলিলেও বিশেষ দোষ হয় না। "Being pure and simple is equal to non-being", কোনও সত্তা যদি এইরূপই থাকিত, তাহা হইলে উহার থাকা ও না থাকাতে বিশেষ কোন পার্থক্য হইত না। কিন্তু ইহা শুধু অস্তিত্ব বা শুধু অনস্তিত্ব নহে, উভয়ের সমবায় পদার্থ। সেই জন্যই অপরিবর্ত্তনশীল ও স্থাণুভাবে না থাকিয়া কোনও কিছুতে পরিণত হইতেছে। অনস্তিত্ব ও অস্তিত্বরূপ বিরুদ্ধভাবের সামঞ্জস্যে বিভিন্ন প্রকারের অস্তিত্বের বিকাশ। এইরূপ দুইটি বিরুদ্ধভাবের সামঞ্জস্য ও বিভিন্ন ভাবের পরিণতি হেগেলের ন্যায় শাস্ত্রের মূলসূত্র। শুধু চিন্তা-জগতেই যে এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধভাবের সমন্বয় ও ব্যাপকতর ভাবে পরিণতিরূপ ক্রমবিকাশ ঘটিতেছে, তাহাই নহে। বাস্তবজগতেও এই বিরোধ ও সমন্বয় বিদ্যমান, কারণ হেগেলের মতে বস্তু ও ভাব দুইটি স্বতন্ত্র পদার্থ নহে। উভয়ের ভিতরে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। সুতরাং উভয়েই একই নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত।

দুইটি বিরুদ্ধ পদার্থ পরস্পর সম্বদ্ধ; তাহাদের একটি ছাড়িয়া অন্যটিকে চিন্তা করা মনের পক্ষে অসম্ভব। এই বিরুদ্ধ পদার্থের মধ্যে যিনি সম্বন্ধ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার কাছে ঐ দুইটি পদার্থ বা ভাব কোনও ব্যাপকতর (More general) পদার্থ বা ভাবের মধ্যে সম্মিলিত ভাবে বিদ্যমান। আবার এই ব্যাপকতর ভাবটি তদ্বিপরীত ভাবকে লইয়া অধিকতর ব্যাপক অন্য একটি ভাবে আসিয়া মিশিয়াছে। এইরূপ ভাবের অনন্ত প্রবাহ আসিয়া সমুদ্র-প্রবিষ্ট নদী সমূহের ন্যায় অনন্ত একত্বে (Absolute Unity) মিশিয়াছে। ভাবের এইরূপ গতিকে হেগেলের ত্রিভঙ্গী ন্যায় -(Threefold Logic) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং দেখিতেছি, মানবমনের সমগ্র ভাবনিচয় সূত্রে মণিগণের ন্যায় শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সজ্জিত রহিয়াছে। এই ত্রিভঙ্গী ন্যায় রূপ প্রণালীতেই পদার্থ বা ভাবের বিকাশ।

ভাব — তদ্বিপরীত ভাব

thesis — antithesis

উভয়ের সমন্বয় সাধক

ব্যাপক ভাব।

Synthesis.

যত প্রকার বিরুদ্ধ ভাব হইতে পারে, তাহার চরম সমন্বয় হইয়াছে ব্যাপকতম ভাব বা

Absolute Ideaতে। এই ব্যাপকতম ভাবকে বোধের দ্বারা জানিয়া আমরা সত্যনামে অভিহিত করিয়া থাকি, এবং কর্ম্মের দ্বারা উপলব্ধি করিয়া 'শিবং' বা মঙ্গল আখ্যা প্রদান করি। এইরূপ বোধের মূল সূত্র বিকাশের প্রণালী এবং বিভিন্ন স্তর জানিলেই আমাদের এক অনন্ত অখণ্ড সত্তা হইতে জগৎ সৃষ্টির মূলসূত্র বিকাশের প্রণালী এবং বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয়। কারণ হেগেলের মতে সৃষ্টি এবং চিন্তা একই বুদ্ধির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র।

জ্ঞানের অপরিপক্ক অবস্থায় প্রত্যেকটি বস্তু আমাদের নিকট স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয়। বস্তুনিচয়ের মধ্যে যে কোনও শৃঙ্খলা বা সম্বন্ধ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহা আমরা দেখিতে পাই না। আরও গূঢ়রূপে দৃষ্টি করিলে দেখিতে পাই,—যেটিকে অসম্বন্ধ ও স্বতন্ত্র বস্তু বলিয়া মনে করিয়াছিলাম, তাহার সহিত অন্যান্য বহু পদার্থের সম্বন্ধ রহিয়াছে। আরও গূঢ়ভাবে দেখিলে এই বহুত্বের মধ্যে ভাবের ঐক্য উপলব্ধি হয়। স্বাতন্ত্র-জ্ঞান, সম্বন্ধ-জ্ঞান এবং ঐক্য-জ্ঞান এই প্রণালীক্রমে অগ্রসর হইয়া সাধারণ-জ্ঞান দর্শনে (Philosophy) পরিণত হয়। বহুত্বের ঐক্যের অনুসন্ধানরূপ প্রণালীতেই আমাদের চিন্তাকার্য্য সাধিত হইতেছে। ভাববিকাশের ইতিহাসে অনুসন্ধান করিলে আমরা এই প্রণালী সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। প্রাচীন গ্রীসের ইলিয়াটিক্ সম্প্রদায় এক অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় সত্তাকেই শুধু সত্য বলিয়াছেন। বহুবোধ সর্ব্বৈব মিথ্যা, একই সত্য, ইহাই তাঁহাদের সুদৃঢ় ধারণা। এই বহুর অতীত এক অপরিণামী সত্তার সহিত বাস্তবজগতের বহুর এরূপ আত্যন্তিক বিরোধ ইলিয়াটিক্ কল্পনা করিয়াছেন যে, সেই এককে উপলব্ধি করা মানুষের সম্পূর্ণ সাধ্যাতীত।

অতঃপর প্লেটো ও অ্যারিষ্টটল এই একের বহুর বাহিরে না খুঁজিয়া ভিতরে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আজ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক চিন্তাপ্রণালী ক্রমশঃ উন্নত হইয়া এক ও বহুর সমন্বয়ের চেষ্টা করিতেছে। ব্যবহারিক ও পারমার্থিকের বিরোধ আজও চলিতেছে। বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক কোঁৎ (Comte) এক মূলগত শক্তি (Force) বা সার-পদার্থ (Substance)কে বস্তু সমূহের সত্যস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করা অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তব জগতের ঘটনা সমূহের নিয়ামক কারণ অনুসন্ধান অসঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। বিজ্ঞান এইরূপ কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া কতকগুলি নিয়ম আবিষ্কার করিয়াছেন। বাহ্য ঘটনাগুলি এই নিয়মে পরিচালিত। সুতরাং এই নিয়মই তাহাদের অন্তর্নিহিত মূল সত্য। বাহ্য-ঘটনা পরিবর্ত্তনশীল, অনিত্য, নিয়ম অপরিবর্ত্তনীয় ও নিত্য, কিন্তু বাহ্য-ঘটনা না থাকিলে নিয়মের কোনও প্রয়োজনও বোধ করা যায় না। ঘটনাগুলি আছে বলিয়াই তাহাদের ব্যাখ্যানের জন্য নিয়মের প্রয়োজন। কিন্তু এই ব্যাখ্যানের পক্ষে সম্বন্ধ জ্ঞান বা বিজ্ঞানই পর্য্যাপ্ত নহে। "আছে কেন'র কে'ন, তত্ত্ব কেন," বৈজ্ঞানিক কি তা'র খবর দিবে?" কাজেই দর্শনের প্রয়োজন। কারণ দ্বারা কার্য্য বুঝাইলে, কিন্তু কারণকে বুঝায় কে? সেই পরম কারণের অনুসন্ধানই দর্শন বা (Philosophy) নামে অভিহিত।

"কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইহাই দর্শনোন্মুখতা বা Philosophic attitude. কিসে সকল সমস্যার সমাধান হয়, সকল রহস্য ধরা পড়ে ইহাই দার্শনিকের প্রশ্ন।

সত্য কাহাকে বলিব ?

সহস্র বিরোধের মধ্যে একরূপে যাহা অবস্থিত, যাহা নিজ মহিমায় বিরাজিত, তাহাই সত্য। পরনিয়ন্ত্রিত ও সম্বদ্ধ যাহা, তাহা সত্য নহে। স্বতন্ত্র ও নিঃসম্বদ্ধ পদার্থই সত্য। সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও যাহা অপরিণামী ও একভাবে অবস্থিত তাহাই সত্য, বাহ্য যাহা তাহাই পরিবর্ত্তনীয়। বস্তু সকলের ভাব অপরিবর্ত্তনীয়, সুতরাং ভাবই সত্য। বুদ্ধি যাহাকে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারে তাহাই সত্য, জ্ঞাতা যাহাকে সম্পূর্ণ জানিতে পারে তাহাই সত্য। যে স্বতন্ত্র, সামান্য ব্যাপকতম পদার্থ নিজেকে খণ্ড করিয়া বিশেষ হইয়া নিজের মধ্যে বিরোধ ঘটাইয়া আবার বৃহত্তর ও পূর্ণতর মিলনের দিকে অগ্রসর হয়, উহাই হেগেলের মতে সত্য। আত্মবোধ-বিশিষ্ট আত্মাই এই সত্য-পদার্থ, কারণ সত্য-পদার্থের যে সব বিবরণ ও বিশেষণ পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে তাহা আত্মারই প্রতি প্রযোজ্য। ইহা কিসে প্রমাণ হয় ? দেখা যাউক্।

আত্মজ্ঞান বলিতে আমরা কি বুঝি ? প্রথম চৈতন্য (Consciousness)—অনাত্ম-বিরোধী স্বতন্ত্র আত্মপদার্থ। এখন আত্মা স্বরূপে এই আত্মা ও অনাত্মার মধ্যে বিরোধকে অতিক্রম করিয়া অবস্থিত বলিয়াই ইঁহার সমগ্র জীবন এই বিরোধকে অতিক্রম করার চেষ্টারূপে প্রকাশ পায়। জ্ঞানের দ্বারা ইনি অনাত্মার মধ্যে আত্মাকে দেখিতে পান এবং ব্যবহারিক জীবনে কর্ম্মের দ্বারা ইনি অনাত্ম-প্রকৃতিতে আপনাকে উপলব্ধি করেন। যে অনাত্ম প্রকৃতিকে প্রথমে ইঁহার শত্রু বলিয়া মনে হয়, ইনি জ্ঞান ও কর্ম্মের দ্বারা তাহাকে পরমাত্মীয় বলিয়া উপলব্ধি করেন। আত্মার সমস্ত কর্ম্ম ও চিন্তার চরম পরিণতি সেই জ্ঞানে, যে জ্ঞান প্রথমতঃ আত্মা ও অনাত্মারূপ বিরুদ্ধ পদার্থরূপে প্রকাশিত হইয়া পরে সেই বিরোধকে পরাভূত করিয়া আপনার সঙ্গে আপনার চরম ঐক্য উপলব্ধি করিয়াছে। যাহা বুদ্ধি-গ্রাহ্য তাহাই সত্য। যাহা সত্য তাহাই বুদ্ধি-গ্রাহ্য। ইহাই হেগেলের ন্যায়শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত।

বস্তুজ্ঞান অভিজ্ঞতালব্ধ না মানবের সহজাত ? জর্ম্মাণ দার্শনিক লিব্‌নিজ্ বলিয়াছেন, জ্ঞান ভিতর হইতেই বিকাশ পায়; বাহির হইতে জ্ঞান আসে, এরূপ মনে করা ভ্রম। আবার লক্ বলিতেছেন, বাহির হইতে অভিজ্ঞতা লাভই জ্ঞান। কেহ বা মধ্যম-পন্থা অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, জ্ঞানের কতক অংশ সহজাত, আর কতক লব্ধ, ঘটনা-সমূহ বাহিরের জিনিষ; আর ঘটনার ব্যাখ্যানশক্তি ভিতরের কার্য্য। হেগেল বলিতেছেন একভাবে দেখিলে সব জ্ঞানই অভিজ্ঞতার ফল, আত্মার সঙ্গে অনাত্মার সম্বন্ধ না থাকিলে

কোনও জ্ঞান এমন কি আত্মবোধও হয় না। আবার সমস্ত জ্ঞানই সহজ, কারণ যাহাকে অনাত্মা বলিতেছি, তাহা এমন কিছু একটা বাহিরের পদার্থ নয়। তাহা আত্মারই একবিধ বিকাশ।

পূর্ণজ্ঞানে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অভেদ।

অধ্যাপক হাক্‌স্‌লী আত্মাকে কর্ম্মশক্তিবিহীন দ্রষ্টামাত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মা সাংখ্য পুরুষের ন্যায় অনাসক্ত ভাবে অবস্থিত, তাঁহার কিছু করিবার ক্ষমতা আছে এরূপ ধারণা ভ্রম মাত্র। আত্মার স্বাধীনতা মাত্রও নাই; যাহা কিছু কার্য্য প্রকৃতির। ইহা খাঁটি সাংখ্যদর্শনের কথা। তবে সাংখ্যদর্শন পুরুষকে নিত্য শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বভাব বলিয়াছেন; হাক্‌স্‌লী আত্মার এসব ধর্ম্মে বিশ্বাসী নহেন। হেগেলের চিন্তা প্রণালী ঠিক হাক্‌স্‌লীর উল্টা। স্বাতন্ত্র ও আবয়বিক ঐক্য (Organio unity) বা ভাবের ঐক্য (Ideal unity) সর্ব্বাপেক্ষা ব্যাপকতম সত্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। কোনও কিছু বাহ্য প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, হেগেল ইহা কোনও ক্রমেই স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, অহংবোধবিশিষ্ট মানব হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহাকে আমরা স্থূল জড়নামে অভিহিত করি, ইহার সবই স্বতন্ত্র। বিশ্বের সকল পদার্থ এক অবয়বীর স্বতন্ত্র অবয়ব মাত্র। ফরাসী দার্শনিক কোঁৎও সমস্ত মানবজাতিকে সমষ্টিভাবে এক অবয়বী বলিয়া ধারণা করিয়াছেন বটে, কিন্তু জড়ের সেখানে প্রবেশাধিকার নাই। উহা যে শুধু সেই বিরাট অবয়বীর অঙ্গ নহে, তাহাই নহে, তদ্বিরোধীও বটে। এই বিরোধের সমাধান হেগেল করিয়াছেন। সমস্ত বস্তুরই শেষ সমাধান হইবে তখন যখন জড়কে সেই চেতনের ঘনিষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া জানিতে পারিব। আরও জানিতে পারিব, যাহারই সঙ্গে চেতনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহাই চেতনের একবিধ বিকাশ। জড় ও চেতনের ঐক্য, এইরূপ অবয়ব ও আবয়বীর ঐক্য। বৈজ্ঞানিক মত সমস্ত পদার্থকে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ দ্বারা নিয়মিত বলিয়া মনে করে, তাহাদের যে কোনও স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট আছে, তাহা মোটেই স্বীকার করেন না। কিন্তু সমস্ত জগৎকে যে দার্শনিক মতবাদ এক আত্মবোধরূপ কেন্দ্রবিশিষ্ট বিরাট্ চেতন সত্ত্বা বলিয়া ধারণা করে, সেই মতই এইরূপ পদার্থের পরতন্ত্রতার বাঁধ ভাঙ্গিয়া তাহাকে স্বশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত করে। বিজ্ঞান যেখানে প্রাণ ও চেতনাকেও জড়েই পরিণত করিয়া ফেলে, নবভাবানুপ্রাণিত দর্শন সেখানে জড় ও মৃতের মধ্যেও প্রাণের স্পন্দন দেখিয়া পুলকিত। বিজ্ঞানের কাছে জাগতিক ঘটনা ও প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সম্পূর্ণই মানব-মনের বাহিরের জিনিষ ও শুধু অভিজ্ঞতালব্ধ। বিচার দ্বারা তাহাদের মূল কারণ জানা যায় না। দর্শনের কাছে এমন ঘটনাই নাই, যাহার মূলে কোনও ভাব নিহিত নাই; এমন কোনও জড় বা চেতন পদার্থ নাই, যাহা চিরকাল বুদ্ধির অগোচর থাকিবে; বিশ্বপ্রকৃতির এমন কোনও শক্তি নাই, যাহা বুদ্ধির প্রতিরোধ করিতে সমর্থ। বিজ্ঞান ও দর্শনে এই তারতম্য সত্ত্বেও

বিজ্ঞানেরও প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞান জড় জগতের স্থূল খোসা ভাঙ্গিয়া মানবচিন্তাকে সূক্ষ্মের দিকে লইয়া যায়। উহা দেশ-কালের কঠোর বাধাকে অতিক্রম করিয়া চিন্তা দ্বারা সত্য-নির্ণয়ে সচেষ্ট। এই সত্য নির্ণয় চেষ্টার সাফল্য দর্শনের প্রকৃতি। জড় প্রকৃতি আত্মার বিকাশের পক্ষে বিষম বাধা, কিন্তু এই বাধা অতিক্রম করিয়াই আত্মাকে স্বস্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইবে।

হেগেলের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিকগণ বলিতেন, জড়পদার্থ স্থূল এবং বিস্তৃত; মন বিস্তারশূন্য অবিভাজ্য সূক্ষ্মতম পদার্থ। মন স্বতন্ত্র, জড় পরতন্ত্র; এই দুইটির মধ্যে কোনই ঐক্য নাই, কোনও সম্বন্ধ নাই; কেবল ভগবান দুইটিকে ধরিয়া জোড়া তাড়া দিয়া মিলাইয়া রাখিয়াছেন। তিনি নিজে চেতন এবং স্বশক্তি বলে জড়কে সক্রিয় করিয়াছেন, আর স্বতন্ত্র মনকেই এই জড়ের বিবিধ বিকাশ অনুভব করাইতেছেন। আবার হার্বার্ট স্পেন্সার বলিতেছেন, জগৎ দুইভাবে প্রকাশিত, এক গতিবিশিষ্ট জড়রূপে, আর ভাববিশিষ্ট মনরূপে; এই দুইএর সমন্বয় সাধন বা ইহাদের পরবর্ত্তী অজ্ঞেয় সত্যকে উপলব্ধি করা মানবের সাধ্যাতীত। ইহার সমন্বয় হেগেল করিয়াছেন। তিনি বলেন, বাহিরের পদার্থ সমষ্টি যে স্বতন্ত্র এবং তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধ যে নৈমিত্তিক, তাহার কারণ এই যে, তাহারা কোনও স্বতন্ত্র সত্যেরই বিকাশ—যে সত্য আপনাকে খণ্ড করিয়া বা আত্মদান করিয়াই আপনার অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রাখিয়াছেন।

ফলতঃ আত্মা ও অনাত্মার বিরোধ, জড় ও চেতনের বিরোধ, এক ও বহুর বিরোধ কখনও আত্যন্তিক হইতে পারে না। আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে হইলে, অনাত্মা কি তাহা বুঝিতে হইবে; অনাত্মার মধ্যেও আত্মাই রহিয়াছেন, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। ভীত হইয়া পলাইলে অনাত্মা ছাড়িবে না। অনাত্মাকে অস্বীকার করিয়া শুধু আপনাকে লইয়া থাকিলে আত্মার টিকিয়া থাকা দায় হইয়া পড়ে, কারণ অনাত্মাও যে আত্মারই অপরিহার্য্য অংশ। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ যেমন জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করে না, এই মতানুসারে জগৎ যেমন ভগবানেরই অভিব্যক্তি এবং মানব রূপেই যেমন ভগবানের চরম অভিব্যক্তি, হেগেলের মতেও সেইরূপ। আত্মত্যাগের দ্বারাই আত্মোপলব্ধি করিতে হইবে। যে ক্ষুদ্র আমির সঙ্গে জগতের বিরোধ বলিয়া মনে হইতেছে, সেই ক্ষুদ্র 'আমি'ত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। ক্ষুদ্র 'আমি'র মৃত্যুই আত্মার প্রকৃত জীবন। ভেদ-জ্ঞান সম্বন্ধজ্ঞান অতিক্রম করিয়া ঐক্যজ্ঞান বা Philosophic Consciousness লাভেই ক্ষুদ্র 'আমি'র মৃত্যু হয়। এই ক্ষুদ্র 'আমি'র মৃত্যু হইলেই আত্মস্বরূপ উপলব্ধি হয়, তখন অনাত্মা বলিয়া কিছু থাকে না। আত্মাই সব হইয়াছেন, হইতেছেন ও হইবেন। আত্মত্যাগ দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ—"ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ।" আবার বলি আত্মজ্ঞানই অমৃত—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।"

মানবের চিন্তা প্রণালী বিভিন্ন ভাবের মধ্য দিয়া স্বাভাবিকক্রমে এই সত্যে আসিয়া

পৌছে। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সময়ে মানবের চিন্তাধারা একই সত্যের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। যাহাকে বিরোধ বলিয়া বোধ হইতেছে, উহা প্রকৃত বিরোধ নয়, একই সত্যকে বিভিন্নভাবে দেখিবার চেষ্টা মাত্র। বাস্তব সত্য এক। বহুত্বের মধ্যে ঐক্য রহিয়াছে, বৈষম্যের মধ্যে সাম্য রহিয়াছে, খণ্ডশঃ বিভক্ত জগতের মধ্যে এক অনন্ত অখণ্ড চেতন সত্ত্বা রহিয়াছেন। তিনিই সত্য, সেই সত্যে নিখিল জ্ঞানের পরিসমাপ্তি। সেই "একং সৎ" কে বিপ্রা "বহুধা বদন্তি।"

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বাগ্‌চি

রঙ্গপুর-ভাষার ব্যাকরণ।

প্রারম্ভে আমার একটি কথা বলিবার আছে। বঙ্গাব্দ ১২৯৬ সালে আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় মদনমোহন চৌধুরী, উত্তর-বঙ্গ-প্রচলিত কতকগুলি প্রাদেশিক শব্দ-সংগ্রহ করিয়া বিশেষ প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। উহারই পরিশিষ্টাংশে "ব্যাকরণ" নাম দিয়া,—রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ী, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানের প্রচলিত "ভাষা"-র শব্দব্যুৎপত্তি, শব্দ-বিভক্তি, কৃৎ, তদ্ধিত ও ক্রিয়া-বিভক্তি ইত্যাদির কতকগুলি সাধারণ সূত্র বাহির করিয়াছিলেন। আমার বর্ত্তমান প্রবন্ধ, আমার স্বর্গীয় পিতারই অমর কীর্ত্তির একাংশ মাত্র।

সাধারণ বাঙ্গালা-ব্যাকরণের নিয়ম এতদ্দেশীয় কথায় যতদূর খাটিতে পারে, তাহা খাটিবে; তদ্ব্যতিরেকে বিশেষ বর্ণনীয় কতিপয় বিষয় নিয়ে বর্ণিত হইতেছে।

ক্রমান্বয়ে শব্দ-বিভক্তি, ধাতু-বিভক্তি, কারক, সমাস, কৃৎ, তদ্ধিত ইত্যাদি বিষয়গত যাহা পার্থক্য আছে, তাহাই লিখিত হইতেছে।

১। শব্দ-বিভক্তি।

(ব্যক্তিবাচক), পুং ও স্ত্রী।

	একবচন।	বহুবচন।
১মা	—	-রা,—র্‌-ঘর।
২য়া	-ক্‌	-র্‌-ঘরক্‌।
৩য়া	-ক্‌-দিয়া	-র-ঘরক্‌-দিয়া।
৪র্থী	দ্বিতীয়াবৎ।	
৫মী	হাতে	-র্‌-ঘর্‌ হাতে।
৬ষ্ঠী	-র্‌	-র্‌-ঘরের।
৭মী	-ত্‌	-র্‌-ঘরত্‌।

(ক্ষুদ্রপ্রাণিবাচক ও বস্তুবাচক)

	একবচন।	বহুবচন।
১মা	-টা	-গুলা।
২য়া	-টা, -টাক্	-গুলা,—গুলাক্।
৩য়া	দিয়া,-টা দিয়া	-গুলা দিয়া, -গুলাক্ দিয়া।
৪র্থী	দ্বিতীয়াবৎ।	
৫মী	হাতে, -টা হাতে,	-গুলা হাতে।
৬ষ্ঠী	র্, -টার্	-গুলার্।
৭মী	ত্, টাত,	-গুলাত্।

উদাহরণ।

ব্যক্তি। ক্ষুদ্রপ্রাণী।

পুং—রাম। ক্লীং—মাছি।

একবচন	বহুবচন।	একবচন	বহুবচন।
১মা রাম	রামেরা, রামের ঘর।	মাছিটা	মাছিগুলা।
২য়া রামক্	রামের ঘরক্।	মাছিটা—টাক্	মাছিগুলা—গুলাক্।
৩য়া রামক্ দিয়া	রামের ঘরক্ দিয়া।	মাছিটা দিয়া	মাছিগুলা দিয়া।
৪র্থী দ্বিতীয়াবৎ।		দ্বিতীয়াবৎ।	
৫মী রাম হাতে	রামের ঘর হাতে।	মাছিটা হাতে	মাছিগুলা হাতে।
৬ষ্ঠী রামের	রামের ঘরের।	মাছিরটার	মাছিগুলার।
৭মী রামত্	রামের ঘরত্।	মাছিত্	মাছিগুলাত্।
রামের পর	রামের ঘরের পর।	মাছির পর	মাছিগুলার পর।

বাহুল্য-বোধে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দরূপ বর্জ্জিত হইল।

২। সর্ব্বনাম শব্দ।

অস্মদ্ শব্দ।

	একবচন	বহুবচন।
১মা	অমি, হামি, মুই	আমরা, হাম্‌রা।
২য়া	আমাক্, হামাক্, মোক্	আমার ঘরক্, হামার ঘরক্, হামাক্।
৩য়া	" " " দিয়া।	" " " " " দিয়া।
৪র্থী	দ্বিতীয়াবৎ।	
৫মী	আমাক্, হামাক্, মোকে বা মোরে হাতে—	আমার বা হামার ঘর হাতে।
৬ষ্ঠী	আমার, হামার, মোর	আমার বা হামার ঘরের।
৭মী	আমাত্, হামাত	আমার বা হামার ঘরত্।

ক্রোধ, দম্ভ, অহঙ্কার ও অভিমান ইত্যাদি স্থলেই "হামি" "হামার" ইত্যাদি ব্যবহার হয়।

পঞ্চমী বিভক্তি 'হাতে" প্রায় সর্ব্বত্র প্রচলিত। কেবল রঙ্গপুর জেলার খুব নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থানে, ঐ বিভক্তিস্থলে "হানে" বা "হনে" হইয়া থাকে। আবার এতদঞ্চলের প্রায় সর্ব্বত্রই "হাতে"-র স্থলে "ঠাঁই" ও তদপভ্রংশ "ঠেন্" ও "টে" প্রত্যয়ও দৃষ্ট হয়। যথা,—"তার ঠেন্ ঘণ্টা পাবু" অর্থাৎ তাহার নিকট কিছুই পাইবে না। "টে" ও "হাতে"-র একত্র প্রয়োগও সময়ে সময়ে দৃষ্ট হয়। যথা,—প্রশ্ন—"কলমটা কারটে-হাতে আন্‌লু রে" ?—কলমটা কাহার নিকট হইতে আন্‌লি ? উত্তর "কালু দাদারটে-হাতে"—কালু দাদার নিকট হইতে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে "টে" বা 'ঠাঁই' প্রত্যয় অধিকাংশস্থলে সপ্তমী বিভক্তিতে প্রযুক্ত।

সম্ভ্রম ও তুচ্ছার্থক প্রভেদ ব্যতিরেকে যুষ্মদ্ শব্দ, অস্মদ্ শব্দের ন্যায়। যুষ্মদ্ শব্দে সম্ভ্রমার্থে একবচনে "তোমরা" ও বহুবচন "তোমরাগুলা" ; এবং তুচ্ছার্থে একবচনে 'তুই' ও বহুবচনে 'তোমরা' বা 'তোমরাগুলা' ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়া বিভক্তিতে সম্ভ্রমার্থে একবচনে 'তোমাক্' ও তুচ্ছার্থে 'তোক্' প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। সম্ভ্রমার্থে ষষ্ঠীর একবচনে 'তোমার' হয়। যথা,—

"তোমার প্রহার সহি আমার সন্ধান।"
পলায়া যাইবে যদি আমি এড়ি বাণ॥"

(চণ্ডিকা-বিজয় কাব্য।)

অদস্ শব্দ।

(সম্ভ্রমার্থক)

	একবচন	বহুবচন।
১মা	উম্‌রা	উম্‌রা, উমার ঘর
২য়া	উমাক্	উমার ঘরক্।
৩য়া	উমাক্ দিয়া	উমার ঘরক্ দিয়া।
৪র্থী	দ্বিতীয়াবৎ।	
৫মী	উমার হাতে, উম্‌রা হাতে।	উমার ঘর হাতে।
৬ষ্ঠী	উমার	উমার ঘরের।
৭মী	উমাত্,—উমার পর	উমাত্, উমার ঘরত্, উমার ঘরের পর।

উমার শব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী "উ" স্থলে "ও" এই বর্ণও হয়।

তুচ্ছার্থক অদস্ শব্দের প্রথমায় একবচনে "ওঁয়ায়," "ঔর" এবং 'ঔই' পদ ; এবং দ্বিতীয়ায় একবচনে' 'উয়াক্' পদ হয়। বহুবচনে 'ঘর' বা 'গুলা' শব্দের যথাবৎ প্রয়োগ হয়।

'অদস্ 'শব্দের' ন্যায়, 'এতদ্' বা 'ইদম্' শব্দেও সম্ভ্রমার্থে 'ইম্‌রা' বা 'এম্‌রা' ও তুচ্ছার্থে

"এঁয়ার্" "এঁ্যায়্" পদদ্বয়ের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। বহুবচনে "ঘর" বা "গুলা" শব্দের সর্ব্বত্র ব্যবহার।

যদ্ শব্দ।

(ব্যক্তিবাচক।)

	একবচন	বহুবচন।
১মা	যাঁয়, যাগ্রি	যারা, যামরা, যাম্‌রা গুলা।
২য়া	যাক্	যামার ঘরক্।
৩য়া	যাক্ দিয়া	যাম্‌রা গুলা দিয়া।
৪র্থী	দ্বিতীয়াবৎ।	
৫মী	যাঁয় হাতে	যাম্‌রা গুলা হাতে।
৬ষ্ঠী	যার, যামার	যার ঘরের, যামার ঘরের।
সপ্তমী	যামাক্, যামার পর	যামার ঘরত্, যামরা গুলাত্, যামার ঘরের পর।

তদ্ শব্দ।

(ব্যক্তিবাচক।)

	একবচন	বহুবচন।
১মা	তাঁয়, তাগ্রি	তারা, তাম্‌রা।

'যেহি জন ভজে তাগ্রি ভবে হয় পার।'

(চণ্ডিকা-বিজয় কাব্য।)

তদ্ শব্দের সপ্তমীর একবচন দুষ্প্রাপ্য। এস্থলে অদস্ শব্দের সপ্তমীর একবচন 'উমাত্' এই পদেরই সর্ব্বত্র প্রচলন। অন্য সমুদয় রূপ যদ্ শব্দের তুল্য।

উল্লিখিত 'অদস্' — 'এতদ্-ইদম্' এবং তদ্ ও যদ্ শব্দ বস্তু অর্থেও প্রযুক্ত হয়। বস্তু অর্থে অদস্ শব্দের প্রথমার একবচন 'ঐটা-ওটা', 'ঐকনা-ওকনা' অথবা 'ঐখান্-ওখান্'। "ঐ কোনা"-র দ্রুত উচ্চারণ "ঐকনা"। 'টা', 'কোনা' এবং 'খান্' বস্তুবাচক এই তিনটি প্রত্যয় মাত্র একবচনেই প্রচলিত। বহুবচনে—"-গুলা"। যথা,—নোটাগুলা; পকীগুলা (পক্ষিগুলা) ইত্যাদি। তদ্ধিতাংশে এসম্বন্ধে বিশদ আলোচনা হইবে।

এতদ্—ইদম্ শব্দেরও প্রথমার একবচন—'এটা—একনা অথবা এখানে'। অন্যান্য বিভক্তি অদস্ শব্দের ন্যায়।

শব্দ বিভক্তি সকল প্রায় পূর্ব্বোল্লিখিতবৎ ব্যবহৃত হয়। সময়ে সময়ে স্থলবিশেষে সামান্য এক আধটুকু ব্যতিক্রম হইয়া থাকে মাত্র।

৩। ক্রিয়া-বিভক্তি।

এই প্রকরণে ক্রিয়া-বিভক্তি লিখিত হইল। সকল প্রকার ক্রিয়াতে এই সকল বিভক্তি প্রযুক্ত হইবে।

১ম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ		উত্তম পুরুষ		বিভক্তির নাম
	সম্ভ্রম	অনাদর			
	এক বা বহুবচন	একবচন	একবচন	বহুবচন	
ইবার লাগ্‌ছে	ইবার লাগছেন	ইবার লাগছিস	ইবার লাগছোঁ	ইবার লাগ্‌ছে	বর্ত্তমানা।
এ	এন্	ইস্	ওঁ	ই	নিত্যপ্রবৃত্তা।
উক্	ও, এন্	এক্	ওঁ	ই	আদেশিনী।
ইলে, ইল্	ইলেন	ইলু	ইনু	ইলাঁও	অদ্যতনী।
’ছে	’ছেন	’ছিস্	’ছঁ	’ছি	হ্যস্তনী।
’ছিল	’ছিলেন	’ছিলু	’ছিনু	’ছিলাঁও	পরোক্ষা।
ইবার লাগ্‌ছিল	ইবার লাগ্‌ছিলেন	ইবার লাগ্‌ছিলু	ইবার লাগ্‌ছিনু	ইবার লাগ্‌ছিলাঁও	অসম্পান্না।
ইবে	ইবেন	ইবু	ইম্	ইমো	ভবিষ্যন্তী।

মধ্যমপুরুষে অনাদরের বহুবচন সম্ভ্রমার্থবৎ। পুরা নিত্যবৃত্তা বিভক্তির প্রচলন নাই। কেবল, যদি—তবে এই দুই অব্যয়যুক্ত বাক্যে পুরানিত্যবৃত্তারূপ বিভক্তি যুক্ত হয়। অতএব ঐ বিভক্তির আকার নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

১ম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	উত্তম পুরুষ
একবন | বহুবচন	সম্ভ্রম | তুচ্ছ	একবচন | বহুবচন
ইলে হয়।	ইলেন্ হয় | ইলু হয়।	ইনু হয় | ইলাঁও হয়।

উদাহরণ যথা ;—"যদি তাঁর গেলো হয়, তা হ’লে তাঁর টাকা পাইলে হয়।"

পাবনা জেলার যেরূপ পাইয়া, যাইয়া, খাইয়া প্রভৃতি অনন্তরার্থক ধাতুর স্থলে ‘পায়া’ ‘যায়া’ ‘খায়া’ প্রভৃতি রূপ হয়, রঙ্গপুরাঞ্চলেও তদ্রূপ। ‘করিয়া খাওয়া’, ‘মরিয়া যাওয়া’ প্রভৃতির ‘করি খাওয়া’—‘মরি যাওয়া’ এই রূপান্তর হয়।

নিমিত্তার্থক ‘ইতে’ প্রত্যয়ের স্থানে ‘ইবার লাগে’ ‘ইবার জন্তে’ ইত্যাদি প্রত্যয় হইয়া থাকে।

আরম্ভার্থক, পারণার্থক, আদেশার্থক ও ইচ্ছার্থক ধাতুর উত্তর ‘ইবার’ প্রত্যয় হইয়া থাকে। উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ ‘ইবারের’ "ই" যথাবদুচ্চারিত না হইয়া ঈষৎ এবং অস্পষ্ট উচ্চারিত হয়।

ঔচিত্য ও আবশ্যকতা বুঝাইলে, ধাতুর উত্তর স্বরান্ত স্থলে ‘ওয়া লাগে’ এবং ব্যঞ্জনান্ত স্থলে "আ লাগে" প্রত্যয় হয়। এস্থলে জানা উচিত যে, এই অর্থে ‘ইবার হয়’ প্রত্যয়ও হয়। যথা,—ভাত খাওয়া লাগে; পুথি পড়া লাগে; পুথি প’ড়বার হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত ‘লাগে’ কথার স্থলে কেহ কেহ "খায়" বলে। যথা,—‘বাড়ী যাওয়া খায়’ অর্থাৎ, বাড়ী যাওয়া আবশ্যক।

৪। ণিজন্ত-প্রক্রিয়া।

বাঙ্গালা নিচ্ প্রত্যয় সাধিত ক্রিয়া সকল ইয়া প্রত্যয়ান্ত হইলে, যেরূপ আকার প্রাপ্ত হয়, তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল। যথা,—

আমাক্ পাঠেয়া দেও—আমাকে পাঠাইয়া দাও।
ঘোড়াত্ চড়েয়া দেও—ঘোড়ায় চড়াইয়া দাও।
তাক্ ভাত্ খো'য়া দেও—তাহাকে ভাত খাওয়াইয়া দাও।
তার মুখ ধো'য়া দেও—তাহার মুখ ধোয়াইয়া দাও।
ছাওয়াটাক্ নিন্ পটাও—ছেলেটাকে ঘুম পাড়াও। ইত্যাদি।

৫। কারক।

কর্ত্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ বিরল নহে। যথা,—

"ধান খায়া যায় বানে
মাগী ক্যাদ্লে বারা বানে।"

(প্রবাদ-বাক্য।)

অর্থাৎ,—বন্যায় ধান্য নাশ করিতেছে, আর বেটী তখনও উদূখলে মুষল পেষণ করিতেছে।

"শার্দ্দূলে হরিণে শুতি থাকে একখানে।"

(চণ্ডিকা-বিজয়-কাব্য।)

অর্থাৎ,—ব্যাঘ্র ও হরিণ একত্র শয়ন করিয়া আছে।

Emphasis বুঝাইলে, সকল কারকের সকল বিভক্তি ও বচনে "এ" এই বিভক্তি যুক্ত হয়। যথা,—তাক্ (তাহাকে)— তাক্-এ বা তাকে (তাহাকেই) ; যদু গেইছে (যদু গিয়াছে)—যদু-এ গেইছে (যদুই গিয়াছে।) ; ঘরোত্ (ঘরে)—ঘরোতে (ঘরেই)— ইত্যাদি।

কামতাবিহারী ভাষায়, সম্বন্ধ পদের সাধন-বিষয়ে একটি বিশিষ্ট নিয়ম দেখা যায়। যে সকল অকারান্ত শব্দের হলন্ত উচ্চারণ, তাহাদের ষষ্ঠির র এর অব্যবহিতপূর্ব্বে এক- "এ"- কারের (penultimate vowel) আগম হয়। কিন্তু যে সকল অকারান্ত শব্দের হলন্ত উচ্চারণ নহে—খাঁটি অকার, ষষ্ঠির র এর পূর্ব্বে তাহাদের কোন কিছুরই আগম হয় না। যথা,—মঙ্গলের, বুধের ; কিন্তু "সূর্য্যর"—"গ্রহ-র" ইত্যাদি।

আপনার দৈন্ত লয়া ধাইল সমরে।
বাণবৃষ্টি করে নবগ্রহর উপরে।"   (চ-ন্ডি-কা।)

অন্যান্য কারকে কোন বিশেষত্ব আছে বলিয়া বোধ হয় না। তজ্জন্য পূর্ব্বোক্ত শব্দ-বিভক্তি দ্রষ্টব্য।

৬। সমাস।

ভাষার পুষ্টিসাধনে সমাস যতটা সহায়তা করে, এমন আর কিছুতে নহে। উদাহরণ সহ কয়েকটি সমাস ও তল্লক্ষণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

দ্বন্দ্ব সমাসে বিশেষ কোন বিশেষত্ব নাই। তাৎক্ষণ্য (Immediacy) বুঝাইলে ধাতুর উত্তর ইল্‌ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন বিশেষণের সহিত কোন কোন বিশেষ্যপদের কর্ম্মধারয় সমাস হয়। যথা,—

জন্মিল - ছাওয়া — সদ্যঃ প্রসূত সন্তান।

ফুটিল - ফুল — সদ্যঃ প্রস্ফুটিত পুষ্প।

আর ও কয়েকটি কর্ম্মধারয় সমাসের উদাহরণ যথা,—

ভিন্‌দেশ —— ভিন্নদেশ।

পচিয়া বাও অথবা পইচাও —— পশ্চিমে হাওয়া। ইত্যাদি।

বৃহদর্থ বুঝাইলে, প্রাতিপদিকের উত্তর বহুব্রীহি সমাসে "ডাংরা" প্রত্যয় হয়। যথা—

মাথাডাংরা —— মাথা ডাঙ্গর্ (বড়) যার সে।

পেটডাংরা —— পেট ডাঙ্গর (বড়) যার সে।

আরও কয়েকটি বহুব্রীহিসমাস নিষ্পন্ন পদ যথা—

পর খাওয়া —— পরের খায় যায় (যে), অর্থাৎ, পরান্নভোজী।

নাড়্‌-পানিয়া —— নাড়ে পানি যার, অর্থাৎ, সর্ব্বদা রসাধিক্যযুক্ত—রুগ্ন।

খুঁটা-কপালী —— খুঁটার মত শক্ত কপাল যার।

(মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি।)

বদ্‌-গন্ধি —— বদ্‌ গন্ধ যার, অর্থাৎ, দুর্গন্ধ।

মাউরিয়া —— মাও নাই যার, (মাতৃহীন)।

পল্লীভাষাসুলভ উচ্চারণ-বিকৃতি হেতু অন্যান্য অবশিষ্ট সমাসের উল্লেখ সহজসাধ্য নহে বলিয়া এইখানেই সমাসপ্রকরণের ইতি করিতে হইল।

৭। স্ত্রী-প্রত্যয়।

শব্দের উচ্চারণ-বিভেদ অনেক সময়ে শব্দেরই বিভেদ আনয়ন করে। সুতরাং ঈষৎ-বিকৃত শব্দ, কালে একেবারে বিকৃত হইয়া হয়ত নূতন কোন অর্থ প্রকাশ করে। কোন্‌ দুর্লক্ষ্য সূত্র অবলম্বন করিয়া কাল একটি শব্দের স্থলে নূতন আর একটিকে অভিষিক্ত করিতেছে, কে তাহা নিরীক্ষণ করিবে?

কামতাবিহারী ভাষায়, স্ত্রী-প্রত্যয়ে কোন বিশেষত্ব আমার চোখে পড়ে নাই। দুই এক স্থলে সামান্য উচ্চারণ বিকৃতি ছাড়া, প্রায় সকল স্থলেই অন্যান্য জেলার ভাষার সহিত একরূপ।

৮। বাক্যবিন্যাস।

(কৃৎ ও তদ্ধিত)

প্রাদেশিক কথ্যভাষায় পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কৃৎ ও তদ্ধিত নিষ্পন্ন পদাবলী সংগ্রহ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। আমি যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে কৃদন্ত পদ অপেক্ষা তদ্ধিতান্ত পদ সংখ্যায় অনেক বেশী। আবার কোন কোন 'প্রত্যয়' স্বয়ং কৃদন্ত বা তদ্ধিতান্ত। যথা— "নান্দুরা"। সংস্কৃত নন্দ্ ধাতুর উত্তর উরা প্রত্যয় যোগে এই পুষ্ট প্রত্যয়টি স্বয়ং নিষ্পন্ন। ইহা ব্যক্তিবাচক (Personal suffix); এইরূপ আর একটি প্রত্যয়ও সচরাচর আমরা শুনিতে পাই। তাহা "ভূষা" — ভূষ্ (অলঙ্কারার্থ-প্রীত্যর্থ) ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহারা স্বয়ংসিদ্ধ হইলেও ক্রিয়ার উত্তর বসিয়া কৃদন্ত, ও প্রাতিপদিকের উত্তরে বসিয়া তদ্ধিতান্ত পদের সৃষ্টি করে। যেমন—

পেট্-নান্দুরা——অর্থ পেটুক (তদ্ধিতান্ত)।
খাই-ভূষা——অর্থ ঐ (কৃদন্ত)।

অন্যান্য অঞ্চলে অজ্ঞাত, অথচ সংস্কৃত হইতে আগত বিশুদ্ধ শব্দের ব্যবহার এতদ্দেশে বহুল উদাহরণ স্বরূপ দুই তিনটীর উল্লেখ করা যাইতেছে। সংস্কৃত 'ছর্দ্দি' শব্দের অর্থ বমন। উহার অপভ্রংশ 'ছাদা' ঐ একই অর্থে এদেশে ব্যবহার হয়। তদ্রূপ 'বায়ু' হইতে 'বাও' এবং সন্ত্রাস (ভীতি) হইতে 'অন্ত্রাস্'-এর উৎপত্তি হইয়াছে। 'রসাল'-এর অনুকরণে 'কষাল' শব্দের ব্যুৎপত্তি বস্তুতঃ কৌতুহলপ্রদ। কষায় রস আছে ইহাতে এই অর্থে, 'কষাল' মানে হরীতকী।

জাত অর্থে "আও" এবং 'উয়া' প্রত্যয় হয়। যথা,—পুবাও, পইচাও, ঘরাও; জারুয়া (জারজ), ঘরুয়া (গৃহজাত), বা বাঁশুয়া (যাহারা বাঁশে থাকে, যথা—বাঁশুয়া সাপ) ইত্যাদি। পুবাও—পূর্ব্বদিক্ হইতে জাত; পইচাও—পশ্চিমদিক্ হইতে জাত।

'উঠা'— 'নামা'— 'কামা'— (অশৌচে ক্ষৌরকার্য্য করা) -"নাগা" (লাগান, প্রধানতঃ ভূত, প্রেত ইত্যাদি) প্রভৃতি ধাতুর উত্তর "ক্রিয়তে অনয়া" অর্থাৎ করণার্থে "আনি" প্রত্যয় হয়। যথা,—উঠা হয় ইহাক্ দিয়া 'উঠানি'। 'নামা' হয় ইহাক্ দিয়া 'নামানি'; এতদ্রূপ, কামানি, নাগানি, ঢুকানি, ধোয়ানি ইত্যাদি।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, বস্তুবাচক বিশেষ্যের একবচনে 'কোনা প্রভৃতি প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। কোথায় 'কোন', কোথায় 'টা' এবং কোথায় বা 'খান্' ব্যবহার করিতে হয়, নিম্নলিখিত তালিকাদর্শনে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

টা—	কোনা—	খান্
নোটা—(জলপাত্র - ঘটি)	পিটা—(পিষ্টক)	বাটা—(পানপাত্র)
বাঁশ—	মাস—	থাঁম (স্তম্ভ)

ছাতা—	নেতা—{ গৃহ মার্জ্জন হেতু ব্যবহৃত সিক্ত পাট অথবা ন্যকড়ার পুঁটলি। }	হাতা
গছ—(গাছ)	চারা (চারা গাছ)	খুঁটা (কাঠ)
মাথা—	নগুল (আঙ্গুল)	ঠ্যাং

"টা" সাধারণতঃ অপ্রীতিব্যঞ্জক এবং 'কোণা' তদ্বিপরীত। ক্ষুদ্র দ্রব্যাদি বুঝাইতে হইলে প্রায়শঃ 'কোণা' ব্যবহৃত হয়।

সকল শব্দেরই বুৎপত্তি সংগ্রহ করা অসম্ভব। কারণ উহারা সংস্কৃত বা পার্শী বা অপর কোন ভাষা হইতে সমাগত নহে। উহারা পল্লীভাষারনিজস্ব। পল্লীভাষা যে কেবলই সংস্কৃত বা তদিতর অন্যভাষার কঙ্কালপুষ্ট দেহ, উহার যে এতটুকুও স্বাতন্ত্র্য নাই, একথা বলিলে বস্তুতঃ সত্যের অপলাপ করা হয়। "পল্লীভাষা প্রাণের ভাষা"। প্রাণময় কৃষক-কুলের প্রাণখোলা হর্ষোচ্ছাস এবং প্রাণভরা দীর্ঘশ্বাসের ভিতর দিয়া যে ভাষার সৃষ্টি, তাহা প্রাণস্পর্শী ও স্বাধীন হইবে না কেন? সে কি অপর কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে? ফলতঃ এখনও বঙ্গসাহিত্যকে প্রদাতব্য সামগ্রী পল্লীভাষায় বহু রহিয়াছে। উহাদের সংগ্রহ এবং বর্ত্তমান বঙ্গভাষার অসম্পূর্ণদেহে উহাদের যথাবিধি প্রয়োগদ্বারা বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধনই সাহিত্য-সেবিগণের একমাত্র কর্ত্তব্য। এসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র চৌধুরী মহোদয়ের "পল্লীভাষা ও সাহিত্য"-শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধটি পাঠ করিতে কৌতূহলী পাঠক-মাত্রকেই অনুরোধ করি।

৯। কতিপয় অব্যয়-শব্দের প্রয়োগরূপ।

নিশ্চয়, দৃঢ়তা ও কেবল অর্থে শব্দের উত্তর যে 'ই' প্রত্যয় হইয়া থাকে, তাহার প্রয়োগ নিম্নলিখিতরূপ। যথা—আকারান্ত শব্দের উত্তর "য়্" হয়।

এক্‌লা— এক্‌লায়; আমরা— আমরায়।

ষষ্ঠী বিভক্তি 'র'-এর পর কেহ কেহ 'নাগ্' ও 'না' এই দুই অব্যয়ের প্রয়োগ করিয়া থাকে। ইহাদের কোন সন্তোষজনক অর্থ পাওয়া যায় না। ইহারা বাক্যের অলঙ্কার স্বরূপ। যথা,—

প্রশ্ন — "এক্‌না কাঁয়?"

উত্তর,— "মোর নাগ্ বেটী হয়।" অর্থাৎ এ আমার কন্যা।

'না' এই অব্যয়টির একাধিক প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। কখন কখন ক্রিয়ার ন্যায় ব্যবহৃত হয়; ভবিষ্যকালে ক্রিয়ার উত্তর 'না' এই অব্যয় প্রথম পুরুষে 'নয়' ও 'নোয়ায়', মধ্যম পুরুষে 'নোআন্' ও 'নইস্' এবং উত্তম পুরুষে 'নঁও' বা 'নোঁয়াও' হয়; এবং ক্রিয়াতে ইচ্ছার্থক 'ইবার' প্রত্যয় হয়। যথা, তাঁয় যাবার নয়; মুঁই খাবার-নও; তুঁই দিবার নইস্; অর্থাৎ, তিনি যাইবেন না; আমি খাইব না, তুই দিবি না, ইত্যাদি।

ক্রোধ, দম্ভ বা Emphasis বুঝাইতে 'মোর' পূর্বে 'আ' অব্যয় প্রযুক্ত হয়। যথা,—আ যাইবে তাঁয়; না করো মুই ইত্যাদি।

'লাগ্'-এর ন্যায়, 'হানে' এই অব্যয় নিমিত্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা,—তাঁর কামে গেইল্, মুই থাকলু। তিনি চলিয়া গেলেন, আমি রহিলাম। তদ্রূপ, 'বোহল' বা 'বোলে' এবং 'বেন' এই অব্যয় দ্বয়ের যথেষ্ট প্রয়োগ দেখা যায়।

বোহল বা বোলে = তো।

বেন ঐ।

উদাহরণ যথা,—"তায়ব বোলে (বোহল) কখবারে নোয়ায়, মুই কত জোর্ কলাম, তবে সেনে করচে" অর্থাৎ, সে তো করিত না—আমি কত জিদ্ করিলাম্, তবে ত করিল। "ছাওয়াটা বেন খাবার নোয়ায়, তৈও খোয়াইবে"—ছেলেটা তো খাইবে না, তবু তাহাকে খাওয়াইবে ইত্যাদি।

বাঙ্গালা 'যেন'-র অপভ্রংশ "জোন্"—এবং 'নয়'-এর অপভ্রংশ 'না-হয়' একার্থবোধক। দৃষ্টান্ত যথা,—

"মুই জোন্ (না হয়) মাছোক গেনু, বাড়ীত্ এলা কায় থাকে ?"

অর্থাৎ, আমি নয় মাছ আনিতে চলিলাম, এখন বাড়ীতে কে থাকে ?

উপমার্থে—কেবল 'জোন্' হয়। যথা,—"নরম জোন্ তুলা"—"শক্ত জোন নোআ"। নোআ = লৌহ।

স্মরণার্থ বোধক 'হয়ে'—'হসে' প্রভৃতির স্থানে এতদঞ্চলে 'যাও' শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন, "যাও—বাহে! একটা কথা শুনেন না কেনে ?"

"হয়ে— বাবা! একটা কথা শুনবে ?"

কোন বিষয়ে কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইলে, এতদঞ্চলবাসিগণ 'হর'—'হির্'—'হার্' প্রভৃতি কতিপয় অব্যয় শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে।

'হার্— একটা কথা শুনি যা'—দেখ্—একটা কথা শুনে যা।

বাহুল্যবোধে অধিক দৃষ্টান্ত সংগ্রহে বিরত হইলাম।

রঙ্গপুর প্রভৃতি অঞ্চলে শব্দবৎ অর্থপ্রকাশক (Onomatopoetic যেমন, টুপ্‌টাপ্, হুড়্‌মুড় ইত্যাদি) শব্দ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাদের বিশেষত্ব এই যে, হয়ত দুইটি শব্দ শুনিতে প্রায় একরূপ, অথচ তাহাদের অর্থে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। নিম্নে বর্ণানুক্রমে এইরূপ কতকগুলি শব্দ, ও উহার অর্থ (স্থলবিশেষে উদাহরণ সহ,) উপস্থিত করতঃ বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিব। শব্দ যথা,—

অজ্‌বুজ্—যে বিপরীত বুঝে।

আঁতাপাতালি—অনির্দ্দিষ্টভাবে।

আকাবাকা—ব্যাকুল, উতলা।

৪।

রিক্ত গুরু-ভোজনের পর হয়

ওজনের অতিশয় প্রকাশক বিশেষণ ;

যেমন,—কুম্‌কমা ভারী।

থর্‌থরিয়া—চঞ্চল, অশান্ত।

থম্‌দম—বৃথা শৌর্য্য ও কার্য্যপটুতা প্রকাশ করা।

খিদ্‌খিদ্—রোমাঞ্চের সহিত হর্ষ।

খের্‌খেরা—গ্রাহ্য করা। এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি বেশ কৌতূহলজনক। সংস্কৃত কৃ ধাতুর সহযোগে 'তৃণায়' ও 'তৃণং' পদ প্রয়োগ হয়; তদনুকরণে তৃণ অর্থাৎ খড় (এতদ্দেশীয়েরা তাহাকে 'খের্' বলে) হইতে এই পদটী সিদ্ধ। অন্য অঞ্চলে এই শব্দের প্রয়োগ কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

গোর্‌-গোরা—অতি গভীর।

গোদ্-গোদা—বিমর্ষ-ভাবাপন্ন বা [illegible]।

ঘপ্-ঘপেয়া—অস্পষ্টভাবে।

চক্‌টাদা—ধাঁধা।

চুন্‌চুনা লাগা—ক্রমশঃ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়া।

ছ্যাং-ছ্যাঙ্গা—ঠাণ্ডা, শীতল।

ছোক্-বোক্ করা—সন্দেহ বা ইতস্ততঃ করা। (hesitate)

জুল্-জুল্—ফ্যাল্ ফ্যাল্—(দৃষ্টিকরা অর্থে।)

টপ্-টপা—তরলপদার্থে পূর্ণ।

টস্ টস্— ।

টম্-টম্—হাঁটু গুটাইয়া কুঁজো হইয়া বসিয়া থাকার ভাব।

টুপ্-টুপা—পাণ্ডুবর্ণ।

ঢোক্ ঢোকা—অমিতব্যয়ী।

তেল্-তেলা—অতিশয় কোমল।

থাং-না-থাং—অবহেলা, তাচ্ছিল্য।

দেশ্-দেমা—দীর্ঘস্থূত্রী।

জল্-জলা—উজ্জ্বল।

নেম্ নেমা—লম্বমান।

কাপ্ড়া-চক্ড়া—চিত্রবিচিত্র।

পুত্-পুত্—পুত্রবৎ আদর করা।

ফেট্-ফেটা—পাণ্ডুবর্ণ।

বেদ্-বেদা—কর্দ্দমাক্ত।

ভেড়্-ভেড়া— ।

ভুন্-ভুনা—কুষ্ঠ-কীট।

ভুস্-ভাস্—কচিৎ, কখনও কখনও।

মট্-মটা—দৃঢ়, কঠিন; ক্রুদ্ধ (মনে মনে)। সেকৃ-সেকা—ফ্যাকাশে।
মানাচিনা—মানস কামনা। সোনা সোনা—সুগন্ধযুক্ত।
বাহুধারাধরি—কথাবার্ত্তা। বিৎ [illegible] টি ক্রিয়া
রিপ্-রিপ্—ঈষৎ। খাদ্ ধাতুর সহিত ব্যবহৃত
মুলমুলী—দংশনকারী কীটবিশেষ।

পরিশেষে বক্তব্য এই, রঙ্গপুরের শব্দাবলীর শ্রেণীবিভাগ করতঃ স[illegible] করিবার ইচ্ছা রহিল। তৎসঙ্গে রঙ্গপুরের কতকগুলি Phrase ও [illegible] সংগৃহীত হইবে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দে

সংস্কৃতভাষার পরিণাম।

শব্দব্রহ্মণে নমঃ।

(ইদমন্ধং তমঃ কৃৎস্নং জায়েত ভুবনত্রয়ম্।
যদি শব্দাহ্বয়ং জ্যোতিরাসংসারং ন দীপ্যতে॥)

যদি শব্দাত্মক জ্যোতিঃ সংসার ব্যাপিয়া প্রদীপ্ত না হইত, তবে এই ত্রিভুবন অন্ধকারময় হইত। আচার্য্য দণ্ডী এই সরল পদের দ্বারা স্পষ্টই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, আলোকের অভাবে গাঢ়তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় যেমন লোকযাত্রা নির্ব্বাহ অসম্ভব, তেমনই শব্দের অভাবে পরস্পরের অভিপ্রায়জ্ঞাপনের অভাবনিবন্ধন ব্যবহার সম্পাদনও অসম্ভব। কবির এই সারগর্ভ উক্তির মূলে অভ্রান্ত উপদেশ নিহিত রহিয়াছে। বেদও স্পষ্টাক্ষরে বাক্যকে "জ্যোতিঃ" নামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "বাগ্‌জ্যোতিঃ"। ভাষা শব্দের নিরুক্তানুযায়ী অর্থও "যাহার দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়"। "ভাষ্যতে ব্যবহ্রিয়তে অনয়া"।

লোকযাত্রানির্ব্বাহকারিণী উক্ত ভাষার বোধোপযোগি হেতুনির্ণয় প্রসঙ্গে দর্শনশাস্ত্রে নানা প্রকার যুক্তি তর্কের অবতারণা দেখা যায়। এই বিষয়ে নৈয়ায়িক এবং মীমাংসকদিগকেই অধিকতর নৈপুণ্যোদ্ভাবন প্রয়াসী বলিয়া বোধ হয়। পরমার্থতঃ তত্ত্ব-নির্ণয়-প্রসঙ্গে এই উভয় দর্শনে যেরূপ সারগর্ভ সূক্ষ্ম তর্কের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যত্র সেরূপ বোধ হয় না। যদিও ব্যাকরণকে বেদের মুখ রূপে নির্দ্দেশ করাতে

ইহাই ভাষাজ্ঞানের অসাধারণ হেতু বলিয়া গণ্য হইতে পারে, তথাপি অপেক্ষা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শব্দার্থগ্রহোপযোগী ... ভাষাজ্ঞানের উপায় বলিয়া স্বীকার্য্য। প্রাচীন মনীষিগণ শব্দার্থ গ্রহণের ... নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এই উপায়গুলি ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, বাক্যশেষ বিবরণ এবং প্রসিদ্ধপদের সন্নিধান বলিয়া পরিচিত।*

... যেরূপ মিশ্র-ভৌতিক পদার্থের বিশ্লেষণ দ্বারা মূল সমষ্টিগত ব্যষ্টির স্বরূপ প্রকাশিত করে, সেইরূপ ব্যাকরণও প্রকৃতি প্রত্যয়াদির পার্থক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রত্যেকের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসুর হৃদয়মন্দির হইতে অজ্ঞানতিমির নিরসন পূর্ব্বক তথায় শব্দব্রহ্মের বিমল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া দেয়; ইহাতেই ব্যাকরণসেবী ভাষা বুঝিতে ও প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয়। এই সামর্থ্যের নামই ব্যুৎপত্তি বা শাস্ত্রে অধিকার।

উপমানের দ্বারাও শব্দের অর্থগ্রহ হইয়া থাকে। গরুর মত গবয়, এই উপদেশ শ্রবণকারী মানব ঘটনাক্রমে বনে যাইয়া গো হইতে কতকাংশে ভিন্ন পদার্থে অনেকাংশে গোসাদৃশ্য দেখিয়া, তাহাকে গবয় পদবাচ্য বলিয়া স্থির করিতে পারে। কোষ বা অভিধান শব্দার্থ নির্ণয়ের তৃতীয় হেতুরূপে বিবেচিত হইয়াছে। মনীষিগণ সাধারণের বোধ সৌকর্য্যমানসে, বিভিন্ন স্থলে বিক্ষিপ্ত শব্দগুলি পর্য্যায়াকারে নিবদ্ধ করিয়া রাজকোষের ন্যায় এই শব্দকোষ নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

অজ্ঞাতার্থ শব্দের অর্থজিজ্ঞাসু মানব কোষের সাহায্যে অর্থ নির্ণয় করিয়া জ্ঞাতব্য বিষয়ের তথ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হন। আপ্তবাক্য শব্দার্থগ্রহণের চতুর্থ উপায়, আপ্তশব্দের অর্থসম্বন্ধে রুচিভেদে মনীষিবৃন্দের বিভিন্ন মত দেখা যায়। কাহারও মতে সাক্ষাৎকৃতধর্ম্মা মানব আপ্তনামে পরিচিত, অর্থাৎ যিনি পদার্থের স্বরূপ সাক্ষাৎ করিয়াছেন, তিনি আপ্তনামে অভিহিত। কেহ বলেন যাঁহার ভ্রম প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সা অর্থাৎ প্রতারণার ইচ্ছা নাই, তিনিই আপ্ত; কাহারও মতে যাঁহার বাক্য বিশ্বাসযোগ্য তিনিই আপ্ত। এই ত্রিবিধ মতের ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও বস্তুতঃ বিশ্বাস্য-বাক্যের আপ্তত্ব সকল মতেই স্বীকৃত হইয়াছে। পুত্রের পক্ষে পিতা আপ্ত, ছাত্রের পক্ষে অধ্যাপক আপ্ত, এইরূপ প্রতিযোগিভেদে আপ্ত বহুপ্রকার সম্ভব হয়। আপ্তগণ কণ্ঠোক্তির দ্বারা উপদেশ করেন; ইহার নাম গো, ইহার নাম মেষ, ইহার নাম ঘর ইত্যাদি। লোকের ব্যবহার দেখিয়া শব্দের অর্থগ্রহণ হয়; ইহা পঞ্চম উপায় বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এইরূপ বাক্যের শেষের দ্বারা, পদার্থের বিবরণ দ্বারা এবং প্রসিদ্ধ পদের সন্নিধানে পাঠের দ্বারাও শব্দার্থের

* "শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান - কোষাপ্তবাক্যাদ্ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্য শেষাদ্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ॥"

নির্ণয় হইয়া থাকে। উপায় দোষগ্রস্ত হইলে উপেয় সম্পাদন হয় না, হইলে দোষদুষ্ট হইয়া থাকে। সর্ষপে ভূত থাকিলে তাহা দ্বারা ভূত ছাড়ান অস কিম্বদন্তীর সারবত্তা নিতান্ত কম নহে। সুতরাং ব্যাকরণ হইতে ব্যবহার প কয়টি অর্থবোধক উপায় কথিত হইয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকের মূলেই নির্দ্দোষি আবশ্যক। ভ্রান্ত অনবহিত ও প্রতারক, ইহাদের অন্যতম কর্ত্তৃক নিবদ্ধ ব ভ্রমপূর্ণ সংস্কার লাভ করিয়া ক্রমে শিষ্যানুশিষ্যের বিস্তৃতি দ্বারা ভ্রা দায়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভ্রম-দোষ-দুষ্ট উপমানের ফলও ইহারই অনুরূপ। পুরাতন কোষের অংশ বিশেষের অনবধারণের ফলে অনেক স্থলেই সাহিত্যের পথ তমসাচ্ছন্ন হইয়াছে। আধুনিক সঙ্কলিত ত্রিদোষদুষ্ট কোষের আকস্মিক বিজৃম্ভণে ব্রহ্মকোষ পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত হইবার সূত্রপাত হইয়াছে। অনাপ্তের প্রতি আপ্তবোধে, কত ভ্রান্ত মতের আবির্ভাব হইয়াছে। ভ্রান্তের ব্যবহার-দর্শন-লব্ধ শক্তিগ্রহের ফলে কত শব্দ নিজের অধিকার ছাড়িয়া বহুদূরে সরিয়া পড়িয়াছে, যুক্তি তর্ক প্রভৃতির সাহায্যে সেই সকল বিষয়ের তথ্য-নির্ণয় সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক। পুরাতত্ত্ব-নির্ণয়োপযোগী উপায়াবলীর মধ্যে শব্দই যে প্রধানতম, সে কথা সুধীগণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। চক্ষুরিন্দ্রিয় পিত্তদুষ্ট হইলে দ্রষ্টা কুন্দ কুমুদ কাশ-কুসুম শঙ্খ শশাঙ্ক প্রভৃতি শুক্ল পদার্থও পীতবর্ণ দেখিতে পায়। আবার রসনায় পিত্তদোষের সঞ্চার হইলে শর্করাও তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। কারণরূপ পিত্তদোষ দূরীভূত না হওয়া পর্য্যন্ত জ্ঞাতার এই বিপর্য্যস্ত জ্ঞান কেহই অন্যথা করিতে সমর্থ হয় না। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের মতে মায়ার আবরণে ব্রহ্মজ্যোতিঃ ঢাকা পড়িয়াছে, তাহাতেই মিথ্যাভূত জগতের আবির্ভাব তিরোভাব হইতেছে। মায়াবরণ বিদূরিত না হইলে মিথ্যা-জ্ঞানবিজৃম্ভিত দ্বৈতভাব কিছুতেই বিলুপ্ত হয় না; সেই জন্য মুমুক্ষুগণ তত্ত্বনির্ণয়া-ভিলাষে আবরণ দূরীকরণার্থই কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হন। পরমার্থতঃ যাঁহারা পুরাতত্ত্বজিজ্ঞাসু, তাঁহাদিগকেও শব্দ জ্যোতির আবরক কদর্থ দূর করিতে হইবে, পক্ষান্তরে পূর্ব্ববর্ত্তী কোষাদির প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন করিলে অনেক স্থলেই অন্ধগোলাঙ্গুলন্যায়ের অনুসরণ হইবে।

সূত্র, বৃত্তি ও ভাষ্য এতত্ত্রিতয়ের সংমিশ্রণে পাণিনির ব্যাকরণ সম্পূর্ণতা লাভ করিয়া যে সময়ে সংস্কৃত-ভাষা জ্ঞানের উপায় রূপে অবলম্বিত হইতেছিল, সে সময়ে প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ বিশ্লেষণে ভ্রম প্রমাদের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ক্রমে কালের আবর্ত্তনে সহজোপায়ে ব্যাকরণ জ্ঞানের আবশ্যকতা অনুভূত হইলে, সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ততর ও সংক্ষিপ্ততম ব্যাকরণের প্রচার আরব্ধ হইয়াছে। এই সংক্ষিপ্তপ্রিয়তার ফলে সংস্কৃত ভাষার পরিণাম শোচনীয় হইতে শোচনীয়তর হইতেছে, মহাভাষ্যের সহিত সম্পর্ক-রহিত অভিনব ব্যাকরণের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনেক স্থলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এই সকল সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণে, পাণিনীয় মতের উপেক্ষা পূর্ব্বক অভিনব প্রত্যয়ের

প্রবেশও দৃষ্ট হইতেছে। এই অদৃষ্টের প্রত্যয় কল্পনার ফলে পাঠকের জ্ঞান সঙ্কীর্ণ পড়িয়াছে, কারণ সূত্রের অব্যাপকতা দোষে প্রকৃত শুদ্ধ প্রয়োগও অশুদ্ধ বলিয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ এই স্থলে একটি সূত্রের উল্লেখ করা যাইতেছে। কদাচিৎ, ন প্রভৃতি স্থলে বিভক্ত্যন্ত কিম্ শব্দের পর চিৎ, চন শব্দের সন্নিবেশ দেখিয়া মুগ্ধবোধাদি ব্যাকরণে চিচ্চন প্রত্যয়ের বিধান করা হইয়াছে। এই বিধান কেবল বিভক্ত্যন্ত কিম্ শব্দের পরে * ব্যবস্থিত হয়, সুতরাং এই সূত্রের প্রভাবে মহাভাষ্যপঠিত "জাতুচিৎ" প্রয়োগ অশুদ্ধ শ্রেণীভুক্ত হইতেছে। কারণ এইগুলি কিম্ শব্দের রূপ নহে। বৃদ্ধ পাণিনি এই সকল প্রয়োগ সাধনের জন্য সূত্র প্রণয়নের অবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। বার্ত্তিককার কাত্যায়নের মনেও ন্যূনতা প্রতিভাত হয় নাই। কারণ তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, অসাকল্যার্থ চিচ্চন শব্দের সহিত "সুপ্ সুপা" সমাসেই এই সকল প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে।

কলাপসম্মতগণব্যাখ্যাকার রমানাথের লেখনী ব্রাহ্মণের মস্তক চূর্ণ করিতেও আশঙ্কা করে নাই; "ম্লেচ্ছবাক্তায়াং বাচি" এই গণ পাঠও ম্লেচ্ছ ধাতুর অর্থ অব্যক্ত শব্দ অর্থাৎ অপশব্দ, এই ধাতু হইতেই "ম্লেচ্ছিতবৈ" প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহাতে কোনরূপ আশঙ্কা বা কদর্থ হইতে পারে না, কারণ মহাভাষ্যকার স্বকীয় গ্রন্থের উপোদ্‌ঘাতেই ব্যাকরণ প্রয়োজন প্রদর্শন-প্রসঙ্গে বেদের ব্রাহ্মণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ব্যাকরণের অজ্ঞতা বশতঃ অপশব্দ ব্যবহারের ফলে আমরা শিষ্ট সমাজে ম্লেচ্ছ বলিয়া গণ্য হইব, এই ভয়েই দ্বিজাতিগণ ব্যাকরণ পাঠ করিতে বাধ্য; কারণ অপশব্দ প্রয়োগকারী ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হয়।

আদিকবি বাল্মীকির উক্তিতেও সংস্কৃতভাষা দ্বিজাতির একচেটিয়া সম্পত্তিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সীতা-সমীপে উপস্থিত মহাত্মা মারুতি চিন্তা করিয়াছিলেন যে, "যদি আমি সীতা-সমীপে দ্বিজাতির মত সংস্কৃত বাক্য প্রয়োগ করি, তবে সীতা আমাকে কপটাচারী রাবণ মনে করিয়া ভীত হইতে পারেন" † আমাদের রমানাথ মহাশয়ের গণব্যাখ্যার মতে ম্লেচ্ছধাতুর অর্থ ব্যক্ত শব্দ, অব্যক্ত অর্থ পক্ষান্তর বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ম্লেচ্ছ-শব্দ ব্যক্তভাষীর বাচক হইতেছে। তবেই দেখুন, ব্যাখ্যার প্রভাবে ব্রাহ্মণের উপর দর্ভাঘাত হইতেছে কিনা ‡ উক্ত ব্যাখ্যার প্রভাবে ব্যক্তভাষীই ম্লেচ্ছ হইয়া পড়িতেছে।

---

* তস্মাদ্ ব্রাহ্মণেন ন ম্লেচ্ছিতবৈ নাপভাষিতবৈ ম্লেচ্ছো হ বা এষ যদপশব্দঃ। ম্লেচ্ছা মা ভূমেত্যাধ্যেয়ং ব্যাকরণম্।

† যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্
রাবণং মন্যমানা মাং সীতা ভীতা ভবিষ্যতি। সুন্দরকাণ্ড। ৩১ সং। ১৮।

‡ "ম্লেচ্ছিতবৈ" ইত্যাদি বেদের ব্রাহ্মণ।

রমানাথ উপক্রমে যে প্রকার আস্ফালন করিয়াছেন, তাঁহার অবধান বিধান এ সেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, প্রত্যুত ধাতুর প্রকৃতার্থের বিপরীতার্থই অ নিবদ্ধ করিয়াছেন। ইহার কারণ পাণিনি-সম্মত ধাতুপাঠের সহিত পরিচয়াভাব, মহ অদর্শন, এবং অবিচারে ভ্রমপূর্ণ গ্রন্থের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্তি। তিনি যে ধা ব্যাখ্যানে কৃতিত্ব দেখাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সে পুস্তকের মূলেই যথেষ্ট গলদ র "ম্লেচ্ছ + অব্যক্তায়াং হইতেও ম্লেচ্ছব্যক্তায়াং এইরূপ হইতে পারে। প্রদর্শিত স্থলে এইরূ লইলে রমানাথের উপরেই সমস্ত দোষ পতিত হয়, কিন্তু চুরাদিতেও এই ধাতু পঠিত হইয়াছে। তত্রত্য পাঠে মূল গ্রন্থকারেরই সম্পূর্ণ ভ্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের ম্লাপ বাক্যায়াং বাচি ম্লেচ্ছচ" এই উক্তিতে বুঝা যায়, তিনি ব্যক্ত বচনার্থে ম্লাপ-ধাতুর পাঠ না দিয়া চকারানুকৃষ্ট ব্যক্তার্থেই ম্লেচ্ছ-ধাতুর পাঠ করিয়াছেন।

সায়নাচার্য্যের মতেও ম্লেচ্ছধাতু ব্যক্তার্থেই পঠিত হইয়াছে, কিন্তু চুরাদিতেও সায়নাচার্য্য ম্লেচ্ছ-ধাতুকে অব্যক্ত বাগর্থে পাঠ করিয়াছেন। অনেকে অব্যক্ত বাক্ শব্দের অপশব্দার্থ কথনেও প্রয়াস করিয়াছেন। "ইত্যব্যক্ত বাগপশব্দনম্" মাধবীয় ধাতুবৃত্তি। গণপাঠে ধাত্বর্থ সম্বন্ধে মতামত অতি প্রাচীনকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। সায়নাচার্য্যের ধাতু-বৃত্তিতে এই বিষয়ের প্রভূত উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। বেদভাষ্যকার বিরুদ্ধবাদীর মত উপস্থিত করিয়া যুক্তি-তর্কের দ্বারা তাহার খণ্ডন পূর্ব্বক প্রকৃতার্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য যে সকল গ্রন্থকার কেবল উদাহরণ দেখিয়াই ধাত্বর্থ নির্দ্দেশে প্রয়াস করিয়াছেন, তাঁহাদের গ্রন্থের প্রভাবেই ধাতুর অভিনব অর্থ উদ্ভাবিত হইয়াছে, এবং অদ্ভুত রকমের মতামতও দেখা দিয়াছে।

অধুনা যে সকল সংস্কৃত কোষ-গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অমরকোষই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, এবং প্রমাণ বলিয়া গণ্য। গ্রন্থকার প্রতিজ্ঞাতেই বলিয়াছেন যে, তাঁহার নামলিঙ্গানু-শাসন সংক্ষিপ্তাকারে নিবদ্ধ হইবে; সংক্ষেপের অভিপ্রায়েই তিনি প্রভূতভেদসত্ত্বেও কোনরূপ সাজাত্য দেখিয়া পদার্থের পর্য্যায়তা স্বীকার করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহার গ্রন্থ উপদেশ সাপেক্ষ। কেবল ব্যাকরণের জোরে ইহার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া ব্যাখ্যাকর্তৃগণ ইহাতে ভয়ঙ্কর বিভ্রাট ঘটাইয়াছেন। এই ব্যাখ্যা ক্রমে মহার্ণবের বৃহৎ কোষে অনুসৃত হইয়া তত্রত্য অমৃত-ভাণ্ডের সহিত মিলনে অতীব বিস্ময়কর হইয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ এইস্থানে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল।

অমরসিংহ ছোট বড় নানা শ্রেণীর পাত্রকে এক পর্য্যায়ে নিবদ্ধ করিয়া (সর্ব্বমাবপনং ভাণ্ডং পাত্রমামত্রক ভাজনম্) দর্ব্বি প্রভৃতি পাকের উপকরণ গুলিকে একত্র নিবদ্ধ করিয়াছেন, (দর্ব্বিঃ কম্বিঃ খজাকাচ, স্যাত্তর্দ্দুর্দারুহস্তকঃ")। টীকাকার ভানুজী বলেন, হৈমানুরোধে অর্থাৎ হেমচন্দ্রের নির্দ্দেশানুসারে এই পাঁচটি শব্দের পর্য্যায়তা স্বীকার করিতে হইবে। দর্ব্বি কম্বি ও খজাকা এই তিনটি "কয়চ্ছুলী" নামে প্রসিদ্ধ পদার্থের বাচক। তর্দ্দু ও দারুহস্ত শব্দ দর্ব্বি বিশেষকে বুঝায়। টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর মতে দর্ব্বি প্রভৃতি তিনটি শব্দ হাতা

শব্দ ব্যঞ্জনাদি ঘট্টনোপযুক্ত পদার্থরূপ অর্থে পঠিত হইয়াছে। "ব্যঞ্জনাদিঘট্টনোপযুক্ত। ইতি খ্যাতে", তর্দ্দূর ও দারুহস্ত শব্দের অর্থ, দারুময় হস্তাকৃতি, যাহার নাম তাড়ুয়া। তার অভিন্নত্বে কাহারও বৈসত্য দেখা যায় না, কিন্তু মহাভারতে বর্ণিত সূপকার-সনের হস্তে খজা দর্ব্বি উভয়ের স্বতন্ত্র সত্ত্বা দেখিয়া দুইটা জিনিষকে অভেদ বলিয়া চলে কি? * টীকাকার নীলকণ্ঠও দুইটা জিনিষ বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।

খজা শব্দের অর্থ মন্থন দণ্ড, ইহা দ্বারা অঙ্গারের অবক্ষেপণ অথবা পিষ্ট পদার্থের প্রমথন হইয়া থাকে। দর্ব্বির দ্বারা শাকাদির পরিবেশন হইয়া থাকে। তাহার উক্তি এইরূপ ("খজাং মন্থনদণ্ডং অঙ্গারাবক্ষেপনং বা হস্তাকারং পিষ্টবিকার প্রমথনার্থং বা দণ্ডং। খজা-মন্থ প্রহস্তয়ো রিতি বিশ্বঃ। দর্ব্বী শাকাদিপরিবেশননার্থা") বিদারণার্থ দৃ ধাতুর উত্তর উণাদি বিন্ (৪।৫৩) প্রত্যয়ের দ্বারা দর্ব্বি এইরূপ সিদ্ধ হইয়াছে। মন্থনার্থ খজ্ ধাতু হইতে খজাকা রূপ সিদ্ধ হইয়াছে। ইহার খজা ও খজ ইত্যাকার রূপও হইয়া থাকে। ধাত্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে দর্ব্বি হইতে খজাকার পার্থক্যই প্রতিভাত হয়, কারণ মন্থন বিদারণ এক পদার্থ নহে। এই স্থলের বিশ্বকোষ সম্মত ব্যাখ্যা বড়ই কৌতুকাবহ, সুতরাং উল্লেখযোগ্য। "দর্ব্বি (স্ত্রী) দৃণাতি বিদারয়ত্যনেন দৃ বিন্ (বিদৃভ্যাং বিন্ উন্) (৪।৪৪৩)। ব্যঞ্জনাদিকারক হাতা পর্য্যায় কম্বি খজাকা (বিশ্বকোষ ৩৬৫পৃ)। জিজ্ঞাস্য এই, যাহ দ্বারা বিদারণ করা হয় তাহা ব্যঞ্জনকারক নামে অভিহিত হইল কি প্রকারে? বিশ্বকোষ বিদারণ সাধনের ব্যঞ্জন কারকত্বরূপ অর্থ কোথা হইতে প্রাপ্ত হইলেন? যে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, সেইত ব্যঞ্জনকারক নামে কথিত হইয়া থাকে। সূপকার ভীমসেন নিজকে "ব্যঞ্জনকারক" নামে নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন, ("ভজস্ব মাং ব্যঞ্জনকারমুত্তমম্)। বাল্মীকি প্রভৃতির সময়ে যে শব্দ যে অর্থে পঠিত হইত, পরবর্ত্তী কালে তাহার অন্যথা ঘটিয়াছে; সুতরাং এইরূপ স্থলে বিশেষরূপ লক্ষ্য না করিলে অনেক স্থলেই সে যুগের সাহিত্য বুঝা কঠিন হইয়া উঠে।

অতএব সংস্কৃত ভাষার কিরূপ শোচনীয় পরিণাম, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ।

* খজাক দর্ব্বিক করে নিধায়। বিরাটপর্ব্ব।৮।অ।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের একাদশ সাম্বৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ভীমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বি, এ, বি, এস্ সি, (ইত্যাদি) মহাশয়ের অভিভাষণ।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে আপনারা আমাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করিয়া আপনাদের ব্যবহারিক-সাহিত্যে প্রীতির পরিচয় দিয়াছেন, ইহার জন্য আপনাদিগকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। সাহিত্যের যে বিভাগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অনাদৃত ও অনুন্নত, আমি সাহিত্যের সেই বিভাগেই—ব্যবহারিক-সাহিত্য-চর্চ্চাতেই—আমার ক্ষুদ্র শক্তি নিয়োগ করিয়াছি। এদেশে এখনও ব্যবহারিক সাহিত্য গড়িয়া উঠে নাই। সাহিত্যের এ পথে সময় সময় দুই একজন কর্ম্মপ্রাণ সাহিত্য-সেবীর দর্শন লাভ ঘটে, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু তাঁহারা নখাগ্রেই গণনীয়। দুঃখের বিষয়, আধুনিক সাহিত্যের যুগে সাহিত্য-সম্মেলনী বা সাহিত্য-পরিষদের বৈঠকে তাঁহাদের কথা অনেকেই বিস্মৃত হইয়া থাকেন। আধুনিক বাঙ্গলা-সাহিত্যের গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিলেই আপনারা ইহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিবেন। সাহিত্যের ক্রমঃবিকাশ লক্ষ্য করিতে হইলে আমাদের প্রধানতঃ দুইটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, ইহাই সাধারণ রীতি।

বিষয় দুইটি এই:—প্রথমতঃ প্রকাশিত গ্রন্থ-নিচয় ও দ্বিতীয়তঃ সাময়িক বা মাসিক-পত্র। উভয় স্থলেই আমরা দেখিতেছি, আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যে গল্প উপন্যাস ও কবিতার যুগ চলিতেছে। প্রকাশিত গ্রন্থ নিচয়ের অধিকাংশই এই শ্রেণীর সাহিত্য,—বাঙ্গালী পাঠক-সমাজেও এরূপ তরল সাহিত্যের বিক্রয় ও প্রসার অত্যধিক। মাসিক পত্রের পৃষ্ঠাতেও ইহাদের অবাধ দৌরাত্ম্য চলিতেছে। আধুনিক সময়ের কয়েক খানা প্রধান প্রধান মাসিক-পত্র দেখিলেই আপনাদের ধারণা জন্মিবে।

কেহ কেহ বা দুই-চারিখানি হস্তক বা শিলালিপি বা তাম্রফলকের ঐতিহাসিক ও প্রাত্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় ব্যাপৃত। সাহিত্যে ইহাদের প্রয়োজনীয়তা নাই, এ কথা বলি না। কিন্তু ইহাদের আধিক্য হইলে বা এই শ্রেণীর সাহিত্যের চর্চ্চা করিলেই আমাদের সাহিত্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ হইবে না, আধুনিক সভ্যতার যুগে আমাদের ভাষা সর্ব্বতোমুখী হইবে না। এই শ্রেণীর সাহিত্যচর্চ্চায় কিরূপ ফল দাঁড়ায়, বর্ত্তমান বাঙ্গালা-সাহিত্য তাহার নিদর্শন। সাহিত্যে আজকাল ছোট ছোট গল্প, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতার প্রাবল্য অত্যধিক। এ সকলই সাময়িক উত্তেজনার ফল; কিন্তু অগ্রে দীর্ঘকাল মানসিক ব্যায়ামের প্রয়োজন। আধুনিক সাহিত্যে ক্রমেই তাহার অসদ্ভাব হইতেছে। আজকাল কোন কাব্য বা মহাকাব্য প্রকাশিত

হয় না। সাহিত্যের এরূপ অবস্থায় আপনারা একজন ব্যবহারিক সাহিত্যজীবিকে সাহিত্য-পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসনে আহ্বান করিয়াছেন। ইহাতে আপনাদের দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন কিনা, তাহা আপনাদের শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা বলিতে পারেন।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে কয়েকটি কথা বলিয়াছি। এ বিষয়ে আরও দুই একটি কথা বলিয়া, আমি রঙ্গপুরের বর্ত্তমান সাহিত্যালোচনার অন্তরায় প্রভৃতি বিষয়ে দুই একটি বিষয় নিবেদন করিব।

আমাদের সাহিত্য সবল কি দুর্ব্বল, তাহার পরীক্ষাসিদ্ধ প্রমাণ সহজ। আমরা ঘড়ি ব্যবহার করি—রেলে চড়ি—গ্রামোফন শুনি—ট্রামে ভ্রমণ করি, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমাদের ভাষায় ইহাদের যন্ত্র-বিজ্ঞান, কর্ম্ম-প্রণালীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা বা আলোচনা এখনও সম্ভবপর নহে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে,কৃষিপ্রধান দেশে, কৃষকের ক্ষেত্রে দাড়াইলেও আমরা বৈজ্ঞানিকের ভাষায় শস্য-শ্যামল হরিৎ ক্ষেত্র, কৃষিযন্ত্র ও কৃষি-পদ্ধতির আলোচনা করিতে পারি না। বস্তুতঃ আমাদের উচ্চাঙ্গের কৃষি শিল্প বিজ্ঞানের যথোচিত ভাষা নাই। কাব্য ও ঔপন্যাসিক সাহিত্যের স্তূপীকৃত গ্রন্থেও এই অভাব দূর হইবার নহে। অথচ ব্যবহারিক সাহিত্যের যথোচিত বিকাশ না হইলে সাধারণ সাহিত্যও পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠিবে না। বরং ইহাতে সাহিত্যের মেদবৃদ্ধি রোগের সম্ভাবনাই অধিক। ব্যবহারিক-সাহিত্যে ও আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যে পাঠক-সমাজের আগ্রহদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হইবে। ইহা একদিনে বা অনায়াসে সম্পন্ন হইত পারে না। এজন্য মৌলিক-গ্রন্থ প্রকাশ বা বৈদেশিক ব্যবহারিক সাহিত্যের অনুবাদ প্রয়োজন। ইহাতে ভাষায় অনেক স্থলেই যথেষ্ট পারিভাষিক শব্দও গঠন করিতে হইবে। ফলে ভাষার শব্দ-সম্পদ বাড়িবে। আমাদের শিল্প ও বিজ্ঞানে, কর্ম্মক্ষেত্রের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের অনুসন্ধিৎসা ও মৌলিক গবেষণা বাড়িবে। এক্ষণে ইংরাজি বৈজ্ঞানিক জগতের ভাষা কি না (Lingua franca) সে বিচার করিব না, তবে কথা এই, কোন কোন বাঙ্গালী লেখকও ইংরাজিতে আপনাদের মৌলিক গবেষণার ফল প্রকাশ করিতেছেন বাঙ্গালায় সকল প্রকার ভাব প্রকাশ সম্ভবপর নহে, বাঙ্গলায় মৌলিক গবেষণার পাঠক নাই—বাঙ্গালীর সাহিত্যে ইহার আদর নাই, এমন কি এ সকল লেখকের গ্রন্থ বাঙ্গালাতে প্রকাশিত হইলে মুদ্রন-ব্যয়ও উঠে না, এ সকল কথাই ঠিক। কিন্তু মাতৃভাষার ঋণ শোধ করিতে হইলে, মাতৃভাষাকে বৈভবশালিনী করিতে হইলে, এ সকল গ্রন্থ বাঙ্গালাতেও প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। রুষিয়া, জার্ম্মানী ও জাপানের গত অর্দ্ধ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ করিলে মনে আশা হয়, বাঙ্গালীর মৌলিক গবেষণার ফল বাঙ্গালাতে প্রকাশিত হইলে, এক দিন না এক দিন সুধী-সমাজ বাঙ্গালা-সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হইবেন। রুষ গ্রন্থকার প্রথমতঃ যখন তাহার রসায়ন-গ্রন্থ রুষ-ভাষাতে প্রকাশ করেন, তখন এই যুগপ্রবর্ত্তক গ্রন্থ প্রকাশের ফলে রুষের সাহিত্যিক কর্ম্ম-জীবনের গতি ফিরিয়াছিল। এখন রুষ গ্রন্থকার মাতৃভাষাতে

গ্রন্থ লিখিয়া সারস্বত সাধনা করিতেছেন। জর্ম্মানদেশে প্রথমতঃ ল্যাটিন ভাষায় ও জাপানে প্রথমতঃ ইংরাজী ভাষায় এই শ্রেণীর সাহিত্য প্রকাশিত হইত। এখন জর্ম্মানদেশে জর্ম্মান-ভাষায় এবং জাপানে জাপানী ভাষায় গ্রন্থনিচয় প্রকাশিত হইতেছে। অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা তত্তৎ ভাষা শিখিয়াই সেই সকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালাতেও ইহার ব্যতিক্রম হইবে না, ইহা আশা করিতে পারি। জাপানের বিশাল সাহিত্যও গড়িয়া উঠিতেছে। দেশের ও সমাজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া সাহিত্যের অভাব ও গতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে পারিলে, আমাদের সাহিত্য সর্ব্বাঙ্গীন পুষ্টিলাভ করিবে। অধিকন্তু সাহিত্যও সমাজ-সেবায় লাগিবে। কৃষক, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক সকল শ্রেণীর লোকেই মাতৃভাষায় সর্ব্বপ্রকার ভাব পকাশ করিতে পারিবে। তখনই বুঝিব আমাদের সাহিত্য শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষায় যাহাতে বিভিন্ন দেশ ও সমাজের ভাব ও ভাষা প্রকাশের সুবিধা হয়, তাহার চেষ্টাও করণীয়। ইহাই Comparative Philologyর মূল। বস্তুতঃ মাতৃভাষার সাহায্যে প্রতিবেশীর জাতীয় ভাব ও ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিলে ভাষারও সমৃদ্ধি বাড়ে। দুই জাতিতে ভাব বিনিময়েরও আনুকূল্য হয়। বাঙ্গালী লেখক যে এ বিষয়ে একেবারে পশ্চাৎপদ, তাহা নহে। এ বিষয়ের দুই একটি দৃষ্টান্তও দেখিতে পাই। গারো-ভাষার অভিধান, চাক্‌মাজাতির ইতিহাস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে এ বিষয়ে উৎসাহ পাইলে বাঙ্গালা সাহিত্যের এরূপ আলোচনা আরও অধিক হইতে পারে।

সাহিত্যের অভাবের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই এদেশের লেখকও এক সময় সাহিত্য-চর্চ্চায় হস্তক্ষেপ করিতেন। এক সময়ে বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের অপূর্ণতা লক্ষ্য করিয়া বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি পত্র এবং চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। এখনও সেই নীতি অনুসৃত হইতে পারে।

আমাদের পল্লী-সাহিত্যের আকর্ষণ বড় সামান্য নহে। বিভিন্ন পর্ব্বে ও বিবাহে, সঙ্গীত, জারিগান, ভাটিয়াল গান, সারিগান, কবি, টপ্পা, প্রভৃতি বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। উহা হইতে বহু বিষয় এখনও সংগ্রহ করা যাইতে পারে। পল্লী সাহিত্যের এই সকল নিজস্ব জিনিস যতদূর রক্ষা করা যাইতে পারে, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আজকাল বৈদেশিক জাতির সংস্পর্শে ও বৈদেশিক সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের চিন্তা ও কর্ম্মজগতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সাহিত্য তাহারই অনুসরণ করিতেছে। আধুনিক সাহিত্যে যেন প্রাণ নাই। বৈদেশিক পরিচ্ছদের একটি অতুল সৌন্দর্য্য লইয়া, বৈদেশিক সাহিত্যের কলা-কৌশলের বিচিত্র সজ্জায় সাজিয়া, এই শ্রেণীর সাহিত্য চক্ষুর প্রীতি জন্মাইতে পারে; কিন্তু অনেক সময়ে এই শ্রেণীর সাহিত্যে, পরন্তু এ দেশের সামাজিক জীবনে খাপ খায় না। ফলে এই শ্রেণীর সাহিত্য সাধকের অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। সাহিত্যে ইহাদের স্থায়ী প্রভাবও পরিলক্ষিত হইতেছে না।

পল্লী-সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগের একটি স্বাতন্ত্র্য, একটা বিশেষত্ব আছে। তাঁহাদের ভাষা, তাহাদের সুর, তাহাদের শব্দ-বিন্যাস-রীতি সবই যেন আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে মহীয়ান। কবির সুরে ভাষা চলে না, ভাটিয়ালের সুরে সারিগান হয় না। এই পার্থক্য নাই আধুনিক সাহিত্যে। আধুনিক সাহিত্যের পঠন-প্রণালী ও সুর প্রায়ই এক ধরণের। দুই এক জন লেখকের লিপি-কৌশলের একটু পার্থক্য প্রদর্শন করিলেও এই কথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে সন্দেহের একটুও কারণ জন্মে না।

আজকাল নাগরিক সাহিত্য প্রধানতঃই লোক-চরিত্র-চিত্র-বিশ্লেষণমূলক ঔপন্যাসিক সাহিত্য। পল্লি-সাহিত্যের প্রধান গুণ সরল হৃদয়ের অবাধ অকপট উচ্ছ্বাস। নাগরিক সাহিত্যে ও পল্লী-সাহিত্যে এইখানেই পার্থক্য। আপনাদের ইহা প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ, সুতরাং আমার বক্তব্য বিষয় সমর্থনে কোন দৃষ্টান্ত প্রদর্শন না করিলেও কোন ক্ষতি হইবে না। আরও একটি বিষয়ে দুই একটি কথা নিবেদন করিব। সাহিত্যেও আদর্শ সৃষ্টিই আমাদের লক্ষ্য ছিল। প্রকৃত পক্ষে উপন্যাস-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালা সাহিত্যকেIdealistic জগত হইতে Realistic জগতে লইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বেও ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্কিম বাবুর উপন্যাসের তুলনায় ইহা সাধারণে সেরূপ প্রভাববিস্তার করিতে পারে নাই জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হিন্দু মুসলমান বা খৃষ্টানের চক্ষু লইয়া বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে কোন আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করেন নাই। একাধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের স্থান কাব্য ও উপন্যাসেই দেখিতে পাওয়া যায় বঙ্কিমের ভ্রমরও হিন্দুর আদর্শ নারীচরিত্র নহে। সতী সাবিত্রী সীতার দেশে ভ্রমরের জন্ম হইলেও আধুনিক সভ্যতার যুগেও অভিমানিনী ভ্রমর পতি-দর্শনে বিমুখ। তাই সাহিত্যের প্রভাব কি ভাবে কাজ করিতেছে, চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেরই তাহা প্রনিধানযোগ্য। ভ্রমর-চরিত্রে যেরূপ পুরুষোচিত ভাবা প্রকাশ পাইতেছে, ভ্রমরের ব্যবহারেও সেইরূপ পুরুষ হৃদয়ের কঠোরতা দেখা যায়। গোবিন্দ-লালের গৃহাগমনের সংবাদে ভ্রমরের পিতৃগৃহ-যাত্রাই ইহার নিদর্শন, কিন্তু এভাব স্থায়ী হইতে পারে নাই। আবার সেই ভারতীয় নারীর সাধারণ আকাঙ্ক্ষা, মৃত্যু-সময়ে স্বামী-দর্শন-আকাঙ্ক্ষা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত ভ্রমরকে ব্যথিত করিয়াছিল। ইহাই বঙ্কিমের সাহিত্য-কৌশল, প্রাচ্য প্রতীচ্যের ভাব সংঘর্ষের ফল। বঙ্কিমচন্দ্র অদ্ভুত শক্তি লইয়া চিত্র আঁকিয়াছেন। আধু-নিক কোন কোন লেখকও এই বস্তুতান্ত্রিক রীতির অনুসরণ করিয়া 'ইবসেন' প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকের ভাব বাঙ্গালা সাহিত্যেও ছড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহাদের সাহিত্যে যোলকলা বস্তুতান্ত্রিকতা বিদ্যমান। ইহারা সাহিত্যে আর্ট বা কলা-কৌশলের পথে কমলের দুঃখ লিখিতেও লজ্জা করেন না। ইহাদের লেখায় বঙ্কিমের প্রাচ্য প্রতীচ্যের আদর্শ খাড়া করিতে হয়। এই হিসাবে Idealistic ও Realistic সাহিত্যের আলোচনা বা সৃষ্টি আবশ্যক। কাব্য, উপন্যাস, অভিনয় এসব আছে ও থাকিবে কিন্তু সাহিত্যে শৌণ্ডিকা-লয়ের চিত্র অঙ্কনের প্রলোভনে সাহিত্যকে নীতি শূন্য করিয়া তুলিলে পরিণামে সাহিত্যের ও সমা

ত্রের ক্ষতি নিশ্চিত এদিকে আধুনিক লেখকেরা একটু দৃষ্টি রাখেন ইহা বাঞ্ছনীয়। সাহিত্যসাধনার ফলে উন্নত-হৃদয়ের বিকাশ হয়, সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের নীতি-প্রকৃতি উন্নত হয়, আশা করি লেখক মাত্রেই তদ্বিষয়ে সচেষ্ট হইবেন। আজকাল অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে কি উদ্দেশ্য লইয়া এ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারি না। অর্থ-যশ-আকাঙ্ক্ষা ইহার প্রধান কারণ সন্দেহ নাই; কিন্তু সুসাহিত্যের হিসাবে এই দুইটি বিষয় গণনীয় নহে। সাবিত্রীর চরিত্র-কথা অনেক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। দেখিতে পাই প্রায়ই সকলের ভাষা ঔপন্যাসিক কাহারও ভাষা চলিত বা প্রাকৃত; সকলেরই উদ্দেশ্য ভাষার তারল্য ও লিপিকৌশলে আলোচ্য-বিষয়ের সারল্য সম্পাদন। অনেক সময় এ সকল গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ত সিদ্ধই হয় না, বরং ইহাদের অনেক লেখা অস্পষ্ট হইয়া পড়ে। চন্দ্রনাথের 'সাবিত্রী-তত্ত্ব' বিহারীলালের শকুন্তলা-রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ [illegible] আর এখন জন্মেই না।

রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায় চৌধুরী দেখাইয়াছেন যে, রঙ্গপুরের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গ-সাহিত্যের নবযুগে, বিদ্যার উন্নতিকল্পে, রঙ্গপুর বঙ্গদেশের কোন স্থান হইতে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে পশ্চাদপদ হন নাই। কালকাতার হিন্দু স্কুল ও রঙ্গপুরের জিলা-স্কুল সমসময়েই প্রতিষ্ঠিত এবং "প্রভাকর" "সংবাদ ভাস্কর" প্রভৃতির সমসাময়িক আমাদের রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ এবং রঙ্গপুর দিক্‌প্রকাশ। এই নবযুগের প্রবর্ত্তনের সময়েই কুণ্ডীর সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বাবু রমণীমোহন রায় চৌধুরী বাহাদুর বাঙ্গালী বালকদিগকে বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিবার সমীচীন কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক উপদেশ দেন। কিন্তু [illegible]-গৌরব মহাত্মা রমণীমোহন কালীচন্দ্র ও কাশীচন্দ্রের অন্তর্দ্ধানের পর রঙ্গপুর দীর্ঘকালের জন্য নিদ্রিত হইয়া রহিল। তাহার নিদ্রিতাবস্থায় অন্যত্র কলেজ ও বিবিধ বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, কিন্তু রঙ্গপুরের বহুদিবস বিশেষ কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না। অনেকদিন নিদ্রার পর রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এই নিদ্রাভঙ্গের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেল। কলিকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সঙ্গে সঙ্গে রঙ্গপুরের শাখা-পরিষদটির উৎপত্তি ও আমার পরম বন্ধু ও আত্মীয়গণের উদ্যোগেই উহা সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় আমি আপনাকে ধন্য এবং মহাগৌরবান্বিত মনে করিতেছি। এখন আমাদের কার্য্যের সময় আসিয়াছে।

অবশেষে অতি আহ্লাদের বিষয় এইযে [illegible] শ্রীযুক্ত জে, এন্‌ গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী [illegible], রায় বাহাদুর অন্নদামোহন ও বঙ্গদেশের জন [illegible] প্রতিষ্ঠিত হইয়া রঙ্গপুরবাসীর নিদ্রাভঙ্গের আশার [illegible]

আমাদের মাতৃদেবী বঙ্গভাষার দুই একটি পুত্র [illegible] হইলেও মায়ের দুঃখ দূর হইবার নহে। মাতা তাঁহার শত পুত্রের মধ্যে একটি সন্তানেরও দুঃখ থাকিলে যে স্থির থাকিতে পারেন না! সন্তানের দুঃখে মায়ের দুঃখ, অতএব যাঁহার এত সন্তান দুঃখী তাঁহার সুখ কোথায়? যে কোনও উপায়ে হউক, মায়ের দুঃখ দূর করিতে হইবে। এই দুঃখ দূর করিবার

একমাত্র উপায় শিক্ষা-বিস্তার। শিক্ষার ভিত্তি হওয়া চাই ভগবদ্বিশ্বাস। শিক্ষা এরূপ হওয়া চাই, যেন তদ্দ্বারা সুচারুরূপে মানবের চরিত্র গঠিত হয়। কেবল কিছু জানা থাকিলেই চলিবে না। জ্ঞান সম্পূর্ণ হওয়া প্রয়োজন এবং ব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাধারণ জ্ঞান থাকা চাই। নিজের জ্ঞান হইলেই সন্তুষ্ট হইলে চলিবে না। যাহাতে আপামর সাধারণ ঐ জ্ঞানের অধিকারী বা ফলভাগী হন, তদ্বিষয়ে সমুৎসুক হইতে হইবে। স্বদেশ বৎসল হইলেই চলিবে না, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতার পাপস্পর্শ যাহাতে না হয় তাহাদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সমস্ত দেবতার সমবেত শক্তি লাভ করিয়াই চণ্ডী শুম্ভ নিধনে সমর্থ হইয়াছিলেন; সুতরাং এইরূপে দেশের সেবায়, মায়ের সেবায়, অজ্ঞানতা নাশের জন্য আমরা সকলেই এক যোগে যাহাতে শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতে পারি, তাহার চেষ্টা করিতেই হইবে।

শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, আত্মরক্ষা এবং আত্মোন্নতিই শিক্ষার চরম উদ্দেশ্য। সিংহ ব্যাঘ্রাদি জীব তীক্ষ্ণ নখর ও দন্ত দ্বারা, সর্প বিষ দ্বারা এবং উদ্ভিজ্জগৎ কণ্টকাদি দ্বারা সর্ব্বদা আত্মরক্ষা করে। মনুষ্য আপনার মনরূপ যন্ত্রদ্বারা জাগতিক সমস্ত জীব ও জড়পদার্থের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন। এই মনের উন্নতিই শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য। এই জন্যই দেখিতে পাই, "মন নক্ষেতি ব্যাজানাৎ।" জাতানি মনসা জীবন্তি, মনঃ প্রয়ন্ত্যাভিসং বিশন্তি (তৈত্তরীয়) মনঃ এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" এই ঋষি বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন।

শিক্ষার উক্ত দুইটি উদ্দেশ্য মনে রাখিলে, এবং আমাদের আর্থিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, এখন আমাদের শিক্ষা আত্মরক্ষার জন্যই প্রথমে প্রযোজ্য হওয়া আবশ্যক। যে দেশে কারাগারের পাষণ্ড চোরেরা মহামান্য গবর্ণমেণ্টের নিকট মাসিক খোরাকী ৪৷৹ টাকা হিসাবে পায়, অথচ বহু শ্রমশীল কৃষক মাসে ৩৷৷৹ টাকা উপার্জ্জন করিয়া অনাহারে দিনপাত করে, সে দেশে কি এখনও আত্মরক্ষার সময় উপস্থিত হয় নাই? ঈশ্বরের অতিশয় প্রিয়পাত্র দু-একজন ব্যতীত শতকরা নব্বই জনের আত্মরক্ষার্থ আর্ত্তনাদ ব্যতীত দুই এক জনের আত্মোন্নতির গীত কি শুনিতে পাওয়া যায়? তাই বলিতেছি যে সমস্ত বঙ্গের জন্য বঙ্গভাষায় সত্বর সমস্ত ব্যবহারিক কৃষি, বাণিজ্য, শিল্প, কলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধীয় যাবতীয় পুস্তক প্রণয়নের জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া প্রয়োজন। এবং আমাদের বালকদের আমাদের মাতৃভাষায় ঐ সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিলে অল্পায়াসে তাহারা সর্ব্ববিদ্যা আয়ত্ত করিয়া মাতৃভাষার উন্নতি এবং দারিদ্র্যাসুরের বিনাশ করিতে সক্ষম হইবে। অর্থকরী বিদ্যার বিস্তার না হওয়াতেই আমাদের দেশের এইরূপ সর্ব্বনাশ সাধিত হইয়াছে। আমাদের দেশের কাঁচা জিনিষ, যথা চামড়া ইত্যাদি মাটির দরে বিদেশীয়েরা ক্রয় করিয়া লইয়া সেই সমস্ত দ্রব্যজাত পণ্য বহুমূল্যে পুনরায় আমাদের নিকট বিক্রয় করায়, আমরা দিন দিন অধিকতর দরিদ্র হইয়া পড়িতেছি। আমাদের অজ্ঞানতাই ইহার প্রধান কারণ। আমাদের নিজের চেষ্টা নাই, একমাত্র সরকার বাহাদুর কি করিবেন? এইরূপে অজ্ঞতানাশ করাই

আমাদের মাতৃপূজার প্রধান কার্য্য, সুতরাং যাহাতে আমাদের ব্যবহারিক রসায়ন, কৃষি-বিদ্যা ইত্যাদির বহুল প্রচার হয়, সে বিষয়ে কাল বিলম্ব না করিয়া চেষ্টা করা উচিত।

আমাদের ছাত্রদের যেন জীবনের কোন উদ্দেশ্য নাই, পড়িতে হয় পড়িলাম, এইরূপ ভাব সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়। জীবনের উদ্দেশ্য না থাকায় যে যে বিষয় পড়ে, তাহাতে প্রাণ মন ঢালিয়া দিতে পারে না, বিষয়টি হয়ত সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম না করিয়াই মুখস্থ করিয়াছে! সুতরাং কলেজে পড়া শেষ হইলেই সে বিদ্যায় তাহার কোন বিশেষ লাভ হয় না এবং অন্য বিদ্যার্থীরও উহার দুরবস্থা দেখিয়াই বিদ্যায় পূর্ণ আস্থা হইতে পারে না। এইরূপে ছাত্রগণ যদি বিষয়টি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, তাহা হইলে অল্লায়াসসাধ্য হওয়ায় উহা শিক্ষা করিতে মনোযোগী হইতে পারে, এবং বাঙ্গালা-ভাষায় যদি ঐরূপ পুস্তক প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে কিরূপ আশাপ্রদ হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। সুতরাং সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য আমাদের ব্যবহারিক ও অর্থকরী শাস্ত্রের বঙ্গানুবাদ করিয়া মায়ের শ্রীবৃদ্ধি করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার উপাদান বঙ্গভাষায় কৈ? আবার যাহা প্রকৃত উপাদান, তাহা রঙ্গপুরে কতদূর সম্ভব? তিন চারি রাত্রি জাগিয়া চারি পাঁচখানি পূর্ব্বপ্রকাশিত গ্রন্থ মিলাইয়া বিশ্বাসযোগ্য গ্রন্থ লিখিবার রীতি চলিয়াছে। সাধারণ সাহিত্যেও কি এই নীতি অনুসৃত হইবে?

বাংলা সাহিত্যের আরও একটি বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাহি। বাঙ্গালা মুদ্রিত সাহিত্যের প্রথম যুগে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও মধ্য ভাগে অনেক য়ুরোপীয়ান লেখকের গ্রন্থপত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মে সাহেবের গণিত, হারেল সাহেবের গণিতাঙ্ক, এড্‌মণ্ড সাহেবের সেক্ষপীয়রের অনুবাদ, স্মিথ সাহেবের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত প্রভৃতি বহু গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা যায়। আমার এক জন সাহিত্যিক বন্ধু এই শ্রেণীর বহু গ্রন্থ সংগ্রহ করিতেছেন। বাঙ্গালা-সাহিত্যে ইহাদের আলোচনা হয় নাই। এ সকল গ্রন্থ-পত্রের আলোচনা হইলে আমরা সেই সময়ের সাহিত্য এবং সাহিত্যের মধ্য-বর্ত্তিতায় সেই সময়ের শিক্ষা প্রভৃতি বহু বিষয় জানিতে পারি। এই শ্রেণীর গ্রন্থ এক স্থলে পাওয়া অসম্ভব তবে চেষ্টা করিলে এই শ্রেণীর গ্রন্থ এখনও সংগ্রহ হইতে পারে।

এক্ষণে রঙ্গপুরের সাহিত্য সম্পর্কেও দুই একটি কথা নিবেদন করিব। আপনারা এসকল কথা কখনও আলোচনা করেন নাই, আমি ইহা মনে করি না। সাহিত্য-পরিষদ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয় রঙ্গপুরের ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহার ইতিহাস গ্রন্থ কতদিনে প্রকাশিত হইবে জানি না। এই গ্রন্থখানা প্রকাশিত হইলে আমরা আশা করি, সেই গ্রন্থে রঙ্গপুরের প্রাচীন ও আধুনিক যুগের সাহিত্যের বিস্তৃত বিবরণ পাইতে পারিব। এবিষয়ে সাহিত্য-পরিষদের সভাপতি রাজা মহেন্দ্ররঞ্জন রায়চৌধুরী মহাশয় আপনাদিগকে অনেক কথা শুনাইয়াছেন। আমি এস্থলে তাহার পুনরুক্তি করিব না। রঙ্গপুরের প্রাচীন সাহিত্যের এখনও অনুসন্ধান সন্ধান চলিতেছে। সাহিত্য-পরিষদ কোন কোন গ্রন্থ ইতিমধ্যে প্রকাশিত করিয়াছেন। এখনও সাহিত্য-

পরিষদের গৃহে সংগৃহীত বহু পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে, আমি আশা করি সাহিত্য-পরিষদ এই সকল পাণ্ডুলিপি পরীক্ষায় হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এবং ইহাদের প্রকাশ আপাততঃ-সম্ভবপর না হইলেও অন্ততঃ তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সাধারণ্যে প্রকাশের ব্যবস্থা করিবেন। তজ্জন্য সাহিত্য-পরিষদের সংশ্রবে একটি স্বতন্ত্র শাখা-সমিতি গঠন করা যাইতে পারে। প্রাচীন সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক সাহিত্যের যুগে আমরা রঙ্গপুরের কুণ্ডী ও কাকিনায় সাহিত্য-চর্চ্চার দুইটি কেন্দ্র স্থান দেখিতে পাই। কুণ্ডীর ৺কালীচন্দ্র চৌধুরী ও কাকিনার ৺শম্ভুচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ই যথাক্রমে এই দুইটি কেন্দ্রের নেতা। এই দুইটি কেন্দ্রের সাহিত্যিক আন্দোলনের ইতিহাস সঙ্কলিত হয় ইহা আমার একান্ত ইচ্ছা। রঙ্গপুর আপনার স্থান রক্ষা করিতে পারিয়াছে কি না, এই দুই স্থানের সাহিত্যিক ইতিহাস সঙ্কলিত হইলেই আপনারা তাহা বুঝিতে পারিবেন রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদও এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। কাকিনার নবরত্ন সভার বিষয় আপনারা অনেকেই জানেন। এই সময় ভূম্যধিকারী শম্ভুচন্দ্র বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও উর্দ্দুতে কবিতাও লিখিতেন, তাঁহার আনন্দ-সভা-রঞ্জনচম্পু" কুণ্ডীর কালীচন্দ্রের রঙ্গপুর বার্ত্তার বিবরণ আপনারাও অবগত আছেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তও কুণ্ডীতে সাহিত্যিক আকর্ষণে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কালীচন্দ্রের বংশধর আজ সাহিত্যপরিষদের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি, রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় আবার রঙ্গপুরে একটা সাহিত্য-কেন্দ্র গড়িয়া উঠিবে। এ বিষয়ে প্রত্যেক রঙ্গপুর-বাসীর কর্ত্তব্য রহিয়াছে, ইহা বলাই বাহুল্য। শম্ভুচন্দ্রের "আনন্দ-সভা রঞ্জন চম্পু", ভূম্যধিকারী ৺নীলকমল লাহিড়ী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "কৃষিতত্ত্ব" ৺কামাখ্যাচরণ মুখোপাধ্যায় কাব্যকণ্ঠবিদের স্ত্রী-শিক্ষা জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর "হস্তিতত্ত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থ লোপ পাইতেছে। ইঁহাদের বংশধরেরা এই সকল দুষ্প্রাপ্য লুপ্তপ্রায় গ্রন্থের পুনঃ প্রকাশ করিতে পারেন না কি? এই সকল গ্রন্থকর্ত্তাদের সাহিত্যিক কীর্ত্তি, সাহিত্যিক সাধনা, লোপ পাইলে তাঁহাদের পারলৌকিক আত্মা কখনও তৃপ্ত হইবে না এ কথা আমরা বলিতে পারি। "কৃষিতত্ত্ব" রংপুরের প্রথম মুদ্রিত কৃষিগ্রন্থ, সুতরাং ইহার লোপ হইলে, রঙ্গপুরের কৃষি-সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থখানাই লোপ পাইবে। আমার পরমবন্ধু পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার পিতৃদেবের অমূল্য গ্রন্থখানি নূতন পরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া মুদ্রিত করিতে স্বীকার করিয়াছেন। এই শ্রেণীর গ্রন্থ অর্থাভাবে প্রকাশিত হইতেছে না, বা অর্থলোভে এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইতেছে না, এই কথা মনে করিলেও পাপ হয়। এরূপ বৃহৎ কার্য্যের জন্য আমাদের সমবেত চেষ্টার প্রয়োজন ব্যষ্টি সমষ্টি, দুইই চাই।

রঙ্গপুরে বহু ভূম্যধিকারী বাস করেন। ইঁহারা বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া-কর্ম্মে অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া থাকেন। এই সকল অনুষ্ঠানের স্মৃতি-রক্ষা-কল্পে ইঁহারা কোন গ্রন্থ প্রকাশ করিলে, বা গ্রন্থ-প্রকাশে আর্থিক সাহায্য করিলে, অনায়াসে সাহিত্যের একটা মহদুপকার

প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। রঙ্গপুরের অনেক গ্রন্থকার অর্থাভাবে গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের সংশ্রবে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ-প্রকাশ-তহবিল থাকিলে রঙ্গপুরের দুঃস্থ সাহিত্য-সেবীকে গ্রন্থ-প্রকাশে সহায়তা করা সম্ভবপর হয়। অপরন্তু সাহিত্য-স্মৃতিতে পুরস্কার প্রতিযোগিতাতে গ্রন্থ-প্রকাশ-তহবিলের অর্থ ব্যয়িত হইতে পারে। এইরূপ প্রতিযোগিতায় কিরূপ সুফল ফলে, রঙ্গপুরসাহিত্যের কালাচন্দ্রযুগে নব নাটকের ও পদ্মিনী উপন্যাসের সৃষ্টি তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। অনেক স্থলে কোন কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও বর্ত্তমান সাহিত্যের বাজারে তাহার কোন দর হয় না। এমন কি এই সকল গ্রন্থপত্র বিক্রয়ে অনেক সময়ে গ্রন্থের মুদ্রন ব্যয়ও উঠে না। যে কোন ব্যবহারিক সাহিত্য-গ্রন্থই ইহার নিদর্শন। অথচ সাহিত্যের পুষ্টিবৃদ্ধিতে ইহাদের অপরিহার্য্য প্রয়োজন আছে। এ ক্ষেত্রে এইরূপ গ্রন্থ প্রকাশ তহবিল থাকিলে শুধু লাভের কড়াক্রান্তির সূক্ষ্ম হিসাব না ধরিয়া, সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া এইরূপ কোন কোন গ্রন্থ প্রকাশও সম্ভবপর হইবে।

মুদ্রাযন্ত্র সাধারণতঃ সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করে। আমরা বর্ত্তমান নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের আলোচনা করিব ;—

১। লেখক, পাঠক, সমালোচক।

২। মুদ্রাযন্ত্র।

৩। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র।

রঙ্গপুরের দুই একজন লেখক যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাহা রঙ্গপুরের বাহিরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

রঙ্গপুরের পাঠক বা সমালোচক যে সকল গ্রন্থপত্র পাঠ বা সমালোচনা করেন, রঙ্গপুরের মুদ্রাযন্ত্রে সেই সকল গ্রন্থের একখানাও জন্মগ্রহণ করে নাই। ইহা আমাদের শ্লাঘার বিষয় কি? আধুনিক সময়ে মুদ্রাযন্ত্র সাহিত্যচর্চ্চার মাপকাঠী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রঙ্গপুরের সাহিত্যচর্চ্চা যে মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে, রঙ্গপুরের মুদ্রাযন্ত্র তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। রঙ্গপুরে আজ কাল দুই তিনটি মুদ্রাযন্ত্র আছে। এই সকল মুদ্রাযন্ত্রে সাধারণ চেক্ দাখিলা, তৌজি, বিজ্ঞাপন, অনুষ্ঠান-পত্র ও ক্ষুদ্রায়তন গ্রন্থ বা সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়। রঙ্গপুরে সাহিত্য-চর্চ্চার কোন কেন্দ্র-স্থান গড়িয়া তুলিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই আধুনিক সময়োপযোগী উন্নত মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদ পত্রিকাও স্থানান্তরে মুদ্রিত হয়। ইহাতে কিরূপ অসুবিধা ঘটে সাহিত্যচর্চ্চার কিরূপ ব্যাঘাত জন্মে আপনারা তাহার ভুক্তভোগী, সুতরাং এ বিষয়ে অধিক কিছু না বলিলেও চলে।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদ পত্র ত্রৈমাসিক আকারে এখন প্রকাশিত হইতেছে, মুদ্রাযন্ত্রের অভাবে রঙ্গপুরে ইহা মুদ্রিত হয় না ; সম্ভবতঃ ইহার ফলেই পরিষদের মুখপত্র অনিয়মিত প্রকাশিত হইতেছে। রঙ্গপুরে বৃহদায়তন মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদ

পত্র মাসিকপত্রের আকারে রঙ্গপুরেই প্রকাশ সম্ভবপর হইবে। তখন আরও দু' একখানা মাসিক পত্র প্রকাশিত হইতে পারে। ফলে তখন রঙ্গপুরেই এক সম্প্রদায় লেখকের সৃষ্টি হইবে। তাঁহাদের চেষ্টায় রঙ্গপুরের সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবার পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া আসিবে। ইহা শুধু আমার কথা নহে, যে স্থানেই সাহিত্যিক উন্নতি ঘটিয়াছে, সেই স্থানেই তাহার পূর্ব্বাভাষ এইরূপেই সূচিত হইয়াছে।

উপসংহার ;—

রঙ্গপুর জন্মভূমি হইলেও বিষয়-কার্য্য অনুরোধে জীবনের দীর্ঘকাল আমি রঙ্গপুরের বাহিরে প্রবাসী রহিয়াছি। তথাপি আপনারা আমাকে বিস্মৃত হন নাই, ইহাতে আমি নিজকে সৌভাগ্যবান্ মনে করিতে পারি। রঙ্গপুরের সাহিত্য-ক্ষেত্রে আপনারা আমাকে দু' একটা কথা বলিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে আমি কি ভাবে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব, তাহার যথোচিত ভাষা খুঁজিয়া পাই না। সাহিত্য-ক্ষেত্রে স্থান-মাহাত্ম্য নাই, এ কথা বলিব না। য়ুরোপীয় লেখকদিগের বা পাদ্রী সাহেবদিগের বাঙ্গালা-ভাষার চর্চ্চার কথা ভাবিলেই স্বভাবতঃই শ্রীরামপুরের দিকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিতে হয়। প্রতিভা-শালী শক্তিশালী লেখকের জন্মভূমি বা কর্ম্মভূমি সত্য সত্যই সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। আপনাদের সাহিত্যচর্চ্চার ফলে রঙ্গপুরে কোন প্রতিভাশালী লেখকের উদ্ভব হইলে রঙ্গপুর ধন্য হইবে—সাহিত্যের পীঠস্থান হইবে। আমরা এ আশার বাণী লইয়া, বাণী পূজায় সাহিত্যিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের আশা, আমাদের আকাঙ্ক্ষা, ভগবানের দৃষ্টি সঙ্কেতে পূর্ণ হউক।

বদরপুরের "কেল্লা" ও শিলালিপি।

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানির কল্যাণে বদরপুরের নাম আজ সুপরিচিত। যেখানে বদরপুর জংসনটি অবস্থিত, তাহা হইতে দুই মাইল দূরে, বরাক-নদীর উপরিস্থিত রেলওয়ে সেতুর সংলগ্ন এবং বদরপুর ঘাটষ্টেষণের পার্শ্বেই প্রাচীন এবং প্রকৃত বদরপুর। ইহা শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলার সন্ধিস্থলে অবস্থিত এবং শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ উপবিভাগের বদরপুর থানার অন্তর্ভুক্ত। ইহা চাপঘাট পরগণার একটি মৌজা।

এক সময়ে বদরপুর একটি প্রধান বাণিজ্য-বন্দর ছিল। বস্ত্র এবং ধাতুশিল্পের জন্য ইহার দেশময় খ্যাতি ছিল। শ্রীহট্ট এবং কাছাড় জেলার ইতিহাসের অনেক কীর্ত্তিগাথার সহিত বদরপুরের নাম জড়িত রহিয়াছে। বদরপুর, আলাকুলিপুর, বুন্দাশিল, চাপরা এবং উমরপুর এই সমস্ত মৌজা পরস্পর সংলগ্ন এবং বদরপুরের ঘটনাবলীর সহিত এই সমস্ত স্থানও নানা কারণে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং, অবান্তর হইলেও বদরপুর-কথা প্রসঙ্গে এই সমস্ত স্থানের উল্লেখ করা দূষণীয় হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

বদরপুর নাম-রহস্যের দুইটি কারণ অনুমিত হইয়া থাকে :—

(ক) নৌকার মাঝিরা পাঁচ পীরের দোহাই দিয়া থাকে, ইহা আমরা সকলেই জানি। এক সময়ে বরাকনদীর এই বাঁকে নৌকা-চলাচল বড়ই দুরূহ ব্যাপার ছিল। ঘূর্ণী জলে অনেক পাকা মাঝিকেও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হইত। সেইজন্য বরাক-নদীর এই বাঁক দিয়া নৌকা লইয়া যাইবার সময় মাঝিরা স্থলে উঠিয়া পীর বদরের নামে সিন্নি দিয়া, নৌকা চলাচল করিত।

(খ) শাহবদর নামক জনৈক সাধক (যিনি দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দিন ফিরোজশাহের সেনাপতি তরফ-বিজেতা নসিরুদ্দিনের সহিত শ্রীহট্টে আসিয়াছিলেন, এবং তরফে মুসলমান আধিপত্য স্থাপিত হইলে পর, ধর্ম্মপ্রচারার্থ শ্রীহট্ট জেলার উত্তর-পূর্ব্ব-প্রান্তে গমন করিয়াছিলেন) এইস্থানে বাস করিতেন। তাঁহার অধ্যুষিত স্থান বদরপুর বলিয়া খ্যাত হয়, এবং তথায় একটি দরগা স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে বদরপুরঘাট ষ্টেষণের সম্মুখে যে এসিষ্টান্ট্ ইঞ্জিনিয়ার এর বাংলা আছে, সেই টীলাতেই শাহবদরের দরগা ছিল।

ইংরাজ রাজত্বের পূর্ব্বকালের এবং ইহার প্রায় সমসাময়িক বদরপুরের সহিত নানা ঐতিহাসিক স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে।

(ক) খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ—তখন বাঙ্গালার মসনদে নবাব আলীবর্দ্দি খাঁ উপবিষ্ট। ইঁহার সময়ে আলাকুলিবেগ (যাঁহার নামে আলাকুলিপুর হইয়াছে) শ্রীহট্টের ফৌজদার। শ্রীহট্টের পূর্ব্ব-প্রান্তস্থিত পার্ব্বত্য-জাতিগণের উৎপাত নিবারণ জন্য একজন নায়েব ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি একদল খ্রীষ্টিয়ান গোলন্দাজ সৈন্য সীমান্ত-রক্ষার জন্য সঙ্গে লইয়া আইসেন, এবং বরাক-নদীর তীরে কাছাড় জেলার সীমান্তে একটি

কেল্লা স্থাপিত করেন। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্তে শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় এই বুন্দাশিলের কেল্লাকে মাত্র জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া বদরপুরের কেল্লা বলিয়া লিখিয়াছেন। বুন্দাশিল রোমান ক্যাথলিক গির্জ্জার পার্শ্বেই এই প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বদরপুরের "কেল্লা" প্রকৃত পক্ষে কিছুই ছিল না। শুধু জনশ্রুতির উপরেই নির্ভর করিয়া অনেকেই ইহাকে বদরপুরের কেল্লা বলিয়া থাকেন। সম্প্রতি এই তথাকথিত "কেল্লার" শিরোদেশে অঙ্কিত প্রস্তর-লিপির পাঠোদ্ধার হওয়ায় আমরা প্রকৃত বিষয়টি জানিতে পারিয়াছি, এবং তজ্জন্যই এই নীরস প্রবন্ধের অবতারণা।

বুন্দাশিলের কেল্লা হইতে বদরপুরের "কেল্লা" স্থলপথে প্রায় দুই মাইল। জলপথেও প্রায় আড়াই মাইল।

বদরপুর শ্রীহট্ট ও কাছাড় জিলার সন্ধিস্থলে থাকা হেতু, এবং নদীর তীরবর্ত্তী বন্দর বলিয়া পরিচিত থাকায়, সেই সময় ইহা একটি প্রসিদ্ধ আড্ডার স্থান বলিয়া গণ্য হইত। "Memoir of two Geographical Maps constructed under the orders of Major Hodgson, Surveyor General of India, by Lieutenant T. Fisher 1822—1827" নামক বিবরণ হইতে অবগত হওয়া যায়, খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে স্থলপথে বদরপুর হইয়া কাছাড় যাইবার রাস্তা ছিল, এবং জলপথে সুরমানদী (বরাক) হইয়া শ্রীহট্টের নানা স্থান হইতে কাছাড় যাওয়া যাইত।

শ্রীহট্টে চুণের কারবার বিখ্যাত।

Aitchinson's Treaties, Engagements and Sanads নামক গ্রন্থের ১ম ভাগ, ৬৪ পৃষ্ঠায়, দেখা যায়—১৭৬০ খৃঃ অঃ ২৭ সেপ্টেম্বর মীরকাশেমের সহিত ইংরাজদের এক "সন্ধি হয়, তাহাতে নবাব কোম্পানীকে শ্রীহট্টের চুণ সরবরাহ করার কথার উল্লেখ আছে— One-half of the Chunum produced at Sylhet for 3 years shall be Purchased by Gomasthas of the Company from the people of the Government at the customary rate of the place. The tenants and inhabitants of the District shall receive no injury" উপরি উদ্ধৃত শেষ অংশটুকু হইতে দেখা যায় যে বাণিজ্য-ব্যপদেশে সেই সময়ে প্রজাগণের উপর কোম্পানীর লোকেরা দৌরাত্ম্য করিত। এই প্রকার দৌরাত্ম্য নিবারণ জন্ম বদরপুরে একটি "কেল্লা" নির্ম্মিত হয় ইহা জনশ্রুতি মাত্র। "কেল্লা"টি প্রকৃতপক্ষে ১২০৭ বঙ্গাব্দে নির্ম্মিত হয়। ইংলিস নামক জনৈক ইংরেজ পুরুষের নাম ইহাতে দেখা যায়। এই জন্ম কেহ কেহ অনুমান করিতেন বাণিজ্য-ব্যপদেশে ইংলিস কোম্পানী কর্ত্তৃক ইহা নির্ম্মিত হয়। কারণ উক্তকোম্পানী চুণের ব্যবসা করিতেন। এই "কেল্লা"টি প্রকৃতপক্ষে একটি "শেলখানা" বা Magazine ছিল। উনবিংশতি শতাব্দীর প্রথমভাগে পণ্টনের সাহেব ইহা প্রস্তুত করান। magazineকেই সাধারণ

লোকে কেল্লা বলিয়া থাকিত, ইহা অসঙ্গত অনুমান নহে। ক্রমশঃ জনশ্রুতি ইতিহাসেও স্থান পাইল।

কাছাড় জেলার গেজেটিয়ারের ৪১ পৃষ্ঠে শ্রীযুক্ত এলেন সাহেব বলেন "At Badarpore there are remains of an old Fort on a rock overhanging the Barak" এই পুরাতন "কেল্লা"র ভগ্নাবশেষের একখানি চিত্র দেওয়া গেল (চিত্র নং ১)।

Report on the Progress of Historical Research in Assam নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত গেইট্ সাহেব বলেন—"On a ruined fort at Badarpore, there is an inscription in Bengali, which is so worn out that it can not be deciphered. The only words of interest which have been read are—1207, Sal, Badarpore, Captain, and English. Apparently the fort was erected by some early Collector of Sylhet." সম্প্রতি পাঠোদ্ধার হওয়াতে আমরা জানিতে পারিয়াছি শ্রীহট্টের কোনও কালেক্টর বা রেসিডেন্ট্ ইহা নির্ম্মাণ করান নাই। কারণ, এই লিপিতে যে সমস্ত নাম আছে, শ্রীহট্টের কোনও কালেক্টরের এই প্রকার নাম নাই। কাজেই এই অনুমান সঙ্গত নহে।

যে চিত্রটি দেওয়া হইল তাহা "কেল্লা"র সম্মুখ ভাগের। ইহার সাক্ষাৎ দিয়া শ্রীহট্ট-কাছাড়-ট্রাঙ্ক রোড চলিয়া গিয়াছে। নিকটে ডাকঘর, ডাকবাংলা, রেলওয়ে ঘাট ষ্টেশন। ইহা বরাক-নদীর উপরে শিলাময় একটি টীলাতে অবস্থিত। প্রায় অর্দ্ধমাইল দূরে নদীতীরে কপিলাশ্রমে সিদ্ধেশ্বরের মন্দির। বর্ত্তমান চিহ্নাদি দ্বারা যতদূর অনুমান করা যায়, তাহাতে বোধ হয় নদীর সঙ্গে সংযোগ করিয়া ইহার চতুর্দ্দিকে পরিখার (Trench) ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই সমস্ত আজ ভরাট হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে "কেল্লার" উপরে কোনও ছাদ নাই মাত্র চতুর্দ্দিকে দেওয়াল অবশিষ্ট আছে। দ্বারগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আসাম বেঙ্গল-রেল লাইন নির্ম্মাণ সময়ে জনৈক ইঞ্জিনিয়ার ইহাতে বাস করার সময় দেওয়ালের উপরিভাগে কিছু সংস্কার করিয়াছিলেন মাত্র, এবং অস্থায়ী একটি ছাদের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে ইহা জঙ্গলাকীর্ণ। ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত। একখণ্ড প্রস্তরের উপর একটি খোদিত লিপি ইহার সম্মুখের প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে স্থাপিত আছে (চিত্র নং ২)। এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত গেইট সাহেবের উপরি লিখিত মন্তব্য হইতেও এই কথার সমর্থন হয়। আমরা নিজে অনেকবার সেইস্থানে গিয়া ইহা পাঠ করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইয়াছিলাম। পরে শ্রীহট্টের ডেপুটী কমিশনার সাহেবের যত্নে ইহার একখানি বিশুদ্ধ বৃহৎ আলোক-চিত্র (Photo) গ্রহণ করা হয়। এবং পাঠোদ্ধার জন্য শিলচর নর্ম্মাল স্কুলে প্রেরণ করা হয়। তথাকার সহকারী অধ্যক্ষ সুহৃদবর অক্লিষ্টকর্ম্মা শ্রীযুক্ত জগন্নাথ দেব বি, এ, মহাশয় ইহা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া কতকগুলি শব্দ যথাযথ রূপে পড়িতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বাকীটুকু পূর্ণ করিবার ভার বন্ধুবর আমার উপর দিলেন।

দেখা গেল যে, লিপিকার বর্ণজ্ঞান-হীন। সুতরাং এই প্রকার লোকের লেখা পাঠ করা একটু দুরূহ ব্যাপার। একদিন শ্রীগৌরী গ্রামে শ্রীযুক্ত সনৎকুমার দত্ত চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে, এই ধনীরাম মেস্তরী নির্ম্মিত একটি দেবমন্দিরের গায়ে খোদিত-লিপির অক্ষরের সহিত লেখার তুলনায় এই পাঠোদ্ধার ব্যাপারে আমাকে অনেক সাহায্য করিল। ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, তত্ত্বসরস্বতী, মহোদয় "পল্টন," "সরকার," "ইংলিস," "শেলখানা" এই চারিটি শব্দ যথার্থরূপে পাঠ করিয়া দিয়াছেন। বিশ্বকোষের শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "বরক্ত তদ্বিরান্" (Direct Supervision) এই পাঠটি উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। বাকী যে কয়েকটি শব্দ আছে তাহার পাঠ উদ্ধার করা ক্রমশঃ সহজ হইয়া যায়। শ্রীহট্টের তদনীন্তন ডেপুটি কমিশনার এবং আসাম প্রদেশের বর্ত্তমান প্রধান সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত J. E. Webster C. I. E., I. C. S. মহোদয় এই লিপির পাঠোদ্ধার জন্য আমাকে অনেক উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক ইংরাজিতে সোসাইটীর জার্নালে প্রবন্ধ লিখার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন যাহা দেখা গেল, তাহাতে এই ক্ষুদ্র লিপির পাঠোদ্ধার লইয়া ঐতিহাসিক মহলে একটা বিরাট আন্দোলন সৃষ্টির প্রয়াস করা বৃথা। পংক্তিক্রমে পাঠোদ্ধার ক্রিয়ার ফল নিম্নে দেখান গেল—

১। ইং × × × সন ১২০৭ সাল বাঙ্গালা
২। পরগণে চাপঘাট মুকাম (১) বদরপুর আমলে
৩। শ্রীযুক্ত মেস্তর(২) জর্জ্জ রাপল্ট সাব(৩) :গবণর(৪) পল্টন
৪। শ্রীযুক্ত মেস্তর(৫) জান ইংলিস সাব(৬) বরক্ত তদ্বিরান
৫। নিমা এ(৭) রামদাস ছরবরা(৮) শ্রীনিত্যানন্দ
৬। নিলমণি ভদ্র দএ রায়(৯) শেলখানা বানা এ(১০) শ্রীধনিরাম
৭। রাজমেস্থরি ইতি

(১।২ প্রভৃতি পংক্তি-সংখ্যা আমাদের প্রদত্ত)

ভাষ্য নিম্নে দেওয়া গেল—

১২০৭ বাঙ্গালা সনে এই শেলখানা পরগণে চাপঘাট মোকাম বদরপুরে নির্ম্মিত হয়। সেই সময় মিষ্টার জর্জ্জ রাফল্ট সাহেবএর অধীনে পল্টনের গভর্ণর মিষ্টার জন ইংলিস সাহেব ছিলেন। নিমাইরাম দাসের তত্ত্বাবধানে সরবরাহকার নিত্যানন্দ ও নীলমণি ভদ্রের সাহায্যে ধনীরাম নামক রাজমিস্ত্রী ইহা প্রস্তুত করে।

শিলালিপি খানির আলোকচিত্র ক্ষুদ্রায়তনে পরিণত করিয়া দেখান গেল।

শ্রীবিরজাকান্ত ঘোষ বি, এ

(১) মোকাম (২) মিষ্টার (৩) সাহেব (৪) গভর্ণর (৫) মিষ্টার (৬) সাহেব (৭) নিমাই (৮) সরবরাহকার (৯) দ্বারায় (১০) বানায় অর্থাৎ প্রস্তুত করে।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতের নানা প্রদেশে* —বিশেষতঃ বঙ্গে সত্যনারায়ণের পূজা প্রচলিত আছে। এই পূজার কালাকাল বিচার, উপকরণের বাহুল্য বা ব্যয়ের কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নাই। যে কোনও দিনে ভক্তিশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া রম্ভা, ঘৃত, দুগ্ধ, আটা (অভাবে আতপ চাউলের গুঁড়) এবং চিনি বা গুড় এই সামন্য উপকরণে ধনী দরিদ্র সকলেই সত্যনারায়ণের পূজা করিতে অধিকারী। অভীষ্ট দেবতা পূজার প্রধান উপকরণ ভক্তি। হিন্দু মাত্রেরই ধারণা—ভক্তি সহকারে পূজা করিলে সত্যনারায়ণের কৃপায় কাহারও কোনও বাসনা অপূর্ণ থাকে না। সত্যনারায়ণের পূজোপলক্ষে স্কন্দপুরাণোক্ত রেবাখণ্ডীয় মূল সংস্কৃত কথা পাঠ করিবার প্রথা থাকিলেও অধিকাংশ স্থানেই দেশীয় ভাষায় বিরচিত পাঁচালী পঠিত হইয়া থাকে। জনসাধারণের হৃদয়ক্ষেত্র ভক্তিরস সেচনে সরস করিবার জন্য বাঙ্গালার নানা প্রদেশের প্রাচীন কবিগণ নানা স্থানে নানা ভাবে সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্য-জ্ঞাপক পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কবির রচিত অনেকগুলি পাঁচালীর বিষয় আমরা জানিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে ভৈরবচন্দ্র ঘটক বিরচিত পাঁচালীখানি উল্লেখযোগ্য।

ধর্ম্মবিদ্বেষ দূর করিয়া হিন্দু মোসলমান উভয় জাতির মধ্যে প্রীতিস্থাপন উদ্দেশ্যে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত মহীপুর গ্রাম নিবাসী কৃষ্ণহরি দাস "সত্যপীর" নামে এক সুবৃহৎ "গানের পালা" রচনা করেন † রচয়িতার পিতার নাম রামদেব দাস, মাতার নাম পঞ্চমী। উক্ত উপাখ্যানের প্রথমাংশ এইরূপ—

মালঞ্চানগরে মৈদানব নামে মোসলমান-বিদ্বেষী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশীয় এক রাজা বাস করিতেন। এই রাজার অবিবাহিতা কন্যা সন্ধ্যাবতী স্নানকালে নদীস্রোতে নীয়মান একটি মনোরম পুষ্প লইয়া আঘ্রাণ করেন, তাহাতেই তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পায়। রাজা তাহা জানিতে পারিয়া নিজের কুলমান রক্ষার মানসে, সর্পাঘাতে সন্ধ্যাবতীর মৃত্যু-ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে চিরনির্ব্বাসিতা করেন। বনমধ্যে সন্ধ্যাবতীর গর্ভে সত্যপীরের জন্ম হয়। সত্যপীর মাতামহ মৈদানব রাজার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান করিতে গিয়া কারারুদ্ধ হন, এবং তথায় নিজের অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে কারাবদ্ধ সমস্ত ফকীরদিগকে

* বেহার, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, মধ্যভারত, এমন কি বোম্বাই অঞ্চলে এখনও এই পূজার যথেষ্ট আদর আছে। সাহিত্য পরিষৎপত্রিকা, ২২শ ভাগ ১ম সংখ্যা।

† এই গ্রন্থে রচনার তারিখ নাই। সাদুল্লাপুর থানার সবইন্সপেক্টার শ্রীযুক্ত মহম্মদ মেহের বক্স সাহেব কবি কৃষ্ণহরি দাস কর্ত্তৃক ১১৯০ সনে রচিত রঙ্গপুর-বর্দ্ধনকুঠীর ঐতিহাসিক ঘটনা মূলক একটি প্রাচীন কবিতা রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষদে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

মুক্ত করিয়া তত্রত্য রাজপুরোহিত কুশল-নামধেয় ব্রাহ্মণের পোষ্যপুত্র রূপে অবস্থান করেন। একদিন মালঞ্চানগরের পশ্চিমে "নূর" নদীতে স্নান করিতে যাইয়া বালক সত্যপীর একখানি কোর্-আন্ প্রাপ্ত হন। উহা কুশল ঠাকুরকে দেখাইলে তিনি বলেন—"যেখানে পাইয়াছ, সেইখানে রাখিয়া আইস; কোর্-আন্ পড়িলে ব্রাহ্মণের জাতি যায়।" তখন—

আবার সত্যপীর পিতাকে জিজ্ঞাসে।
কি আছে কোরান্ মাঝে জাতি যায় কিসে ॥

কুশল ঠাকুর বলিলেন—

বিস্‌মোল্লা[১] হরফ আছে, কোরানের আউয়ালে[২]।
ব্রাহ্মণের জাতি যায় সেই নাম নিলে॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি বিস্‌মোল্লা কয়।
শেষকালে সেইজন বৈকুণ্ঠ না পায়॥" ইত্যাদি

কবি সত্যপীরের মুখে বলাইয়াছেন,—

এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর দুই ব্রহ্ম নাই।
সংসারের কর্ত্তা এক নিরঞ্জন গোসাঞি ॥
হস্তপদ নাহি তার করিছে বিহার।
মুখ নাহিক তার করিছে আহার ॥
কর্ণ নাই কথা শুনে চক্ষু নাহি দেখে।
দেখিতে না পায় কেহ সর্ব্ব ঘটে থাকে ॥*
সেই নিরঞ্জনের নাম বিস্‌মোল্লা কয়।
বিষ্ণু আর বিস্‌মোল্লা কভু ভিন্ন নয় ॥
দেশ বহি নানা নদী নানা দিকে যায়।
সমুদ্রে যাইয়া সব একত্রে মিশায় ॥
তেমনি নানান্ জাতি নানা পথ দিয়া।
একস্থানে গিয়া সবে যাবে মিশাইয়া ‡॥

পরে সত্যপীর মৈদানব রাজাকে স্বীয় মতানুবর্ত্তী করিয়া নির্ব্বাসিতা মাতা সন্ধ্যাবতীকে রাজধানীতে আনয়ন করেন।

১। 'বিসমিল্লাহ্' প্রকৃত উচ্চারণ। খোদা তা-আলার পবিত্র নাম স্মরণ পূর্ব্বক মোসলমানগণ কার্য্যা-রম্ভ করেন।

২। প্রথমে।

* উপনিষদের "অপাণিপাদো জবনোগ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদির অনুকরণ মাত্র।

‡ রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিল নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব। মহিম্নস্তব।

ইষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের জামালগঞ্জ ষ্টেশন হইতে ৩ মাইল পশ্চিমে মালঞ্চনগরে এখনও সত্যপীরের স্থান দৃষ্ট হয়। আবার ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে প্রচলিত শঙ্করাচার্য্যের পাঁচালীমতে আলা বাদসাহের অনূঢ়া কন্যার গর্ভে সত্যপীরের জন্ম। সুলতান আলা বাদসাহের কন্যা এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব রাজা মৈদানবের দুহিতা একই ব্যক্তি নহেন এবং উভয়ের জন্মস্থানও যে একই স্থান নহে, তদ্বিষয়ে তর্কের অবতারণা করা অনাবশ্যক। সমাধিস্থান ব্যতীত অন্য স্থানেও পীরের কাল্পনিক 'দরগাহ' সংস্থাপন ও তজ্জন্য ভূসম্পত্তি দান করা অসম্ভব নহে। এ জন্যও হয়ত মালঞ্চা গ্রামে সত্যপীরের স্থান কল্পিত হইয়াছে। সুতরাং পাহাড়পুরের নিকটস্থ মালঞ্চা নগরকে নিঃসংশয়ে সত্যপীরের জন্মস্থান বলা যাইতে পারে না।

মালঞ্চা সত্যপীরের জন্মস্থান হউক বা না হউক সত্যপীর ও তাঁহার জন্মবিবরণ যে কবি শঙ্করের বা কবি কৃষ্ণহরির কাল্পনিক সৃষ্টি নহে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিভাত হয়। সমুদ্র-সমীর-স্নিগ্ধ সুদূর ময়ূরভঞ্জ ও হিমাদ্রির হিমকণবাহি বায়ুস্পৃষ্ট রঙ্গপুর, এই উভয় স্থানের কবিই যখন সত্যপীরকে অনূঢ়ার গর্ভজাত বলিয়াছেন, তখন বলিতেই হইবে,—এই কবিদ্বয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই এই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু কানীন পুত্র সত্যপীরের সহিত পুরাণোক্ত সত্যনারায়ণের কোনও সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নয়।

কেহ কেহ অনুমান করেন—যেরূপ বৌদ্ধ হারীতী দেবী শীতলা নাম্নী হিন্দু দেবতার আসন গ্রহণ করিয়াছেন, যেরূপ চাঁদ সদাগরের অজ্ঞাতসারে তদ্‌গৃহিণী সনকাকর্ত্তৃক মনসাদেবী পূজা পাইয়াছেন, সেইরূপ মোসলমানের সত্যপীর প্রথমে নিম্নশ্রেণীর, পরে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ক্রমে সত্যনারায়ণ নামে পরিচিত হইয়াছেন।

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সুবিখ্যাত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" নামক গ্রন্থে (য় সংস্করণ, ১১৪ পৃঃ) লিখিয়াছেন—"লৌকিক দেবতাগণের পূজা প্রচলনের কারণ নির্ণয় করা কঠিন নহে। যেখানে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়ি, সেইখানেই একটি দুর্ব্বলের সহায় দেবতার আবশ্যক হয়। শিশুদিগকে রক্ষা করিবার জন্য চিন্তিতা মাতা, কি মাতামহীর দুর্ব্বলতাসূত্রে ষষ্ঠী কল্পিত হইলেন। চণ্ডিকা ও হরি চিরপ্রসিদ্ধ দেবতা; কিন্তু বিপদ নিবারণার্থ ও আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে এই দুই দেবতা ঈষৎ নাম ও ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া দুর্ব্বলের সহায়রূপে উপনীত হইলেন; একজনের নাম হইল মঙ্গলচণ্ডী, আর একজনের নাম হইল সত্যনারায়ণ। * * * * * * * ।"

উল্লিখিত অনুমান সঙ্গত হইলে পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত দেবদেবীর অধিকাংশই মাতা ও মাতামহীগণের কপোলকল্পিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মাতা বা মাতামহীদের কল্পনাসূত্রে যে কিরূপে দেবতার উৎপত্তি হয়, আমরা তাহা বুঝিতে অক্ষম। শাস্ত্রে যদি ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, শীতলা, মনসা, সত্যনারায়ণ প্রভৃতির পূজার উল্লেখ না থাকিত, তবে ঐ সকল দেবদেবীর পূজা মাতা মাতামহীদের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিতাম।*

* মৎস্যপুরাণ ১০১ অধ্যায়ে ষষ্ঠীব্রতের বিধান আছে। দেবীভাগবত নবম স্কন্ধের ৪৬ অধ্যায়ে, ভবিষ্যপুরাণ

স্কন্দপুরাণে সত্যনারায়ণপূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। রায় সাহেব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব সিদ্ধান্তবারিধি মহাশয় "বিশ্বকোষে" নানা প্রমাণ সহকারে লিখিয়াছেন— "প্রায় দেড় হাজার বৎসর হইতে চলিল, স্কন্দপুরাণ বর্ত্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে।"

প্রকৃত পক্ষে কোন্ সময় হইতে ভারতবর্ষে সত্যনারায়ণের পূজা চলিয়া আসিতেছে, তাহার সম্যক্ মীমাংসা করা সহজ নহে। পুরাণ সমূহের প্রাচীনত্বের উপর নির্ভর করিলে বলা যায়, বহু পূর্ব্বকাল হইতেই ভারতবর্ষে সত্যনারায়ণ পূজা প্রচলিত আছে, এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

অনুমান আটশত বৎসর হইল, মোসলমানগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছেন, সুতরাং ইহার সাতশত বৎসর পূর্ব্বে স্কন্দপুরাণের কাল এখন হইতে ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে ধরিয়া লইলে) ভারতবর্ষে যে সত্যনারায়ণের পূজা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, আমরা কিছুতেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না।

অনেকেই অবগত আছেন, বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই আসাম প্রদেশে সত্যনারায়ণের পূজা প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশ হইতে এই পূজা আসামে প্রচলিত হওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। অসমীয়াগণ বাঙ্গালীর সংস্পর্শে আপনাদিগকে অশুচি জ্ঞান করেন। এই ঘৃণা "বাঙ্গাল ছুয়া" নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং পুরাণোক্ত সত্যনারায়ণের পূজা ভিন্ন সত্যপীরের সির্ণীদান অসমীয়াগণ কখনই গ্রহণ করেন নাই।

ছুটিখান মোসলমান হইয়াও হিন্দুকবি শ্রীকর নন্দী দ্বারা "জৈমিনি ভারতের" অশ্বমেধ পর্ব্ব এবং তাঁহার পিতা পরাগল খানও কবীন্দ্র পরমেশ্বর দ্বারা "জৈমিনি ভারত" অনুবাদ করান। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক ছুটিখানের মহাভারত প্রকাশিত হইয়াছে। চৈতন্য-চরিতামৃত ও চৈতন্য-ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, গৌড়েশ্বর হুসেন সাহ চৈতন্য-দেবের প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কবিগণকে উৎসাহ দেওয়ায় তাঁহার সময়ে বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল। কবিত্বের জন্য মালাধর বসুকে তিনি গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়াছিলেন। প্রাচীন পুথির আলোচনায় বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থাবান্ পদাবলী রচয়িতা বহু মোসলমান কবির নাম পাওয়া গিয়াছে।

৬৪ অধ্যায়ে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রকৃতি খণ্ডের ১ ও ৪৩ অধ্যায়ে এবং স্কন্দপুরাণে ষষ্ঠীপূজার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন তাঁহার তিথিতত্ত্বে রাজমার্ত্তণ্ডের বচন উল্লেখ করিয়া ষষ্ঠী পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

দেবী ভাগবত নবম স্কন্ধ ৪৭ অধ্যায়, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতি খণ্ডের ৪৭ অধ্যায় এবং কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে মঙ্গল-চণ্ডীর বিস্তৃত বিবরণ আছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দনও তিথিতত্ত্বে মঙ্গলচণ্ডীর ব্যবস্থা দিয়াছেন। কাশীতেও মঙ্গলা গৌরীর অধিষ্ঠান আছে। কিন্তু কুকুরদহের চিকিৎসাস্থান কৌশলীতেও কুশলী দেবী মঙ্গলচণ্ডীর নামান্তর গ্রহণ করিয়া পূজিত হইতেছেন।

স্কন্দপুরাণ প্রভাসখণ্ড ১৩৫ এবং আবন্ত্যখণ্ড ১২ অধ্যায়ে শীতলা দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা আছে।

দেবীভাগবত নবম স্কন্ধের প্রথমাধ্যায়ে, ভবিষ্যপুরাণ ৩২।৩৩ অধ্যায়ে, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখণ্ড ৪৫ অধ্যায়ে মনসার কথা বিবৃত রহিয়াছে।

রঙ্গপুরের কবি বুরহান উল্লা রচিত প্রায় দুইশত বর্ষের প্রাচীন "কেরামৎনামা"য় মোসলমানগণ কর্ত্তৃক হিন্দুর দেবতা পূজার উল্লেখ আছে।*

আমাদের মনে হয়, হয়—মোসলমানগণ হিন্দুর সংস্পর্শে হিন্দুর দেবতা সত্যনারায়ণে শ্রদ্ধালু হইয়া তাঁহাকে কিঞ্চিৎ বিকৃত ও রূপান্তরিত করিয়া সত্যপীর নাম দিয়া সমাজে সিণির ব্যবস্থা করিয়াছেন, নয় হিন্দুদের মধ্যে যাঁহারা ছলে, বলে, কৌশলে ও প্রলোভনে পড়িয়া মোসলমানধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহারা হিন্দুর আচার একেবারে পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া সত্যনারায়ণকে সত্যপীর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহাদিগের দ্বারা সত্যনারায়ণের পূজা সত্যপীরের সির্ণিরূপে মোসলমান সমাজে বিস্তৃত হইয়াছিল।

অষ্টমভাগ "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" দ্বিজ রামভদ্র রচিত "সত্যদেব সংহিতা," দ্বিজ বিশ্বেশ্বর বিরচিত "সত্যনারায়ণের পাঁচালী' কবিচন্দ্র অযোধ্যারাম রায় প্রণীত "সত্যনারায়ণ কথা," দ্বাদশ ভাগ পত্রিকায় দ্বিজ দীনরাম বিরচিত "নারায়ণ দেবের পাঁচালী" এবং চতুর্ব্বিংশ ভাগ ১ম সংখ্যায় দ্বিজ রঘুনাথের "সত্যনারায়ণের পুথি" প্রকাশিত হইয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন বিদ্যাবারিধি মহাশয় কর্ত্তৃক শঙ্করাচার্য্য ও রামেশ্বর কৃত "সত্যনারায়ণ কথা" সংশোধিত ও ব্যাখ্যাত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ফরিদপুরের উকীল শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় দ্বিজ কালিদাস বিরচিত "সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্য" ও ফরিদপুরের অন্তর্গত হাসামদীয়া নিবাসী ৺চন্দ্রকান্ত ন্যায়রত্ন মহাশয় "সত্যনারায়ণের পাঁচালী" প্রকাশিত করিয়াছেন। বসুমতী কার্য্যালয়ের "ক্রিয়াকাণ্ড বারিধি"তে মধুসূদন, কৃপারাম ও শঙ্করাচার্য্যের অপর একখানি পাঁচালী প্রকাশিত হইয়াছে। মেঘনাথ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত "সত্যনারায়ণ ব্রতকথা" সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ঢাকা জেলার অন্তর্গত রোয়াইল নিবাসী নলিনীমোহন রায় মহাশয় স্কন্দপুরাণের প্রস্তাব অবলম্বনে সংস্কৃত ভাষায় "সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্যম্" রচনা করিয়া মুদ্রিত করিয়াছিলেন। উহার আরম্ভ এইরূপ—

বিহিত সমিতয়স্তে নৈমিষারণ্যসংস্থাঃ, কতিপয় মুনিপুত্রাঃ শৌনকাদ্যাঃ কদাচিৎ।
তদধিগতমরণ্যং সূতনামানমিত্থ—মতিথি-বিহিত-পাদ্যৈঃ পূজয়িত্বা পপ্রচ্ছুঃ॥
কলিকলুষ-বিদগ্ধাঃ প্রাণিনো নষ্টপুণ্যা, মুনিবর ভবিতারো ব্যাধিশোকৈকভাজঃ।
উপদিশতু তদানীং মানবানাং গতিঃ কা, নহি নহি ভবদন্যশ্চাস্মদীয় প্রমাণম্। ইত্যাদি

ঊনবিংশ ভাগ চতুর্থ সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যপীরের পাঁচালী প্রবন্ধে ৺অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীকবি পণ্ডিত, রামভদ্র, দ্বিজ গিরিধর, দ্বিজ শিবচরণ, দ্বিজ মোজিরাম ঘোষাল, কবি কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম লিখিত কয়েকখানি অপ্রকাশিত পাঁচালীর পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। দ্বাবিংশ ভাগ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রজনবিলাস রায় চৌধুরী মহাশয় কবিবল্লভ রচিত একখানি পাঁচালীর আলোচনা।

---

* রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা দ্বিতীয়ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা ২০ পৃষ্ঠা।

করিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে শ্রীযুক্ত মুন্সী আব্দুল করিম ঐ পাঁচালী প্রকাশ করিয়াছেন। কবি ৺শিবচন্দ্র সেন (কাঁচাদিয়া, বিক্রমপুর), ফকীররাম দাস, দ্বিজ রামকিশোর, দ্বিজ রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক পল্লীকবি পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত বেলপুখুরিয়া গ্রাম নিবাসী কন্দর্প বাচস্পতির পুত্র দ্বিজ বিশ্বনাথ এক সুবৃহৎ পাঁচালী রচনা করিয়া গিয়াছেন। উহাতে কলিযুগের লক্ষণাদি বর্ণিত হইয়াছে। ৺লালা জয়নারায়ণ সেন এবং তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ী (জপসা, ফরিদপুর), "হরিলীলা" নামে সত্যনারায়ণের কথা এক সুন্দর এবং সুবৃহৎ কাব্যে পরিণত করিয়াছেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে জয়নারায়ণ এবং আনন্দময়ীর স্থান আছে। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক সত্যনারায়ণের যতগুলি পাঁচালী সংগৃহীত হইয়াছে তন্মধ্যে নয়নানন্দ বিরচিত "সত্য নারায়ণ মঙ্গল" সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। উহা ১৬৬৮ শক বা ১১৫৩ সনে অর্থাৎ ১৭২ বৎসর পূর্ব্বে রচিত। বিগত ১৩২০ সালের ২১ শ্রাবণ তারিখের ৯ম বর্ষ ৪৫শ সংখ্যা "মালদহ সমাচারে" প্রকাশ—গোবিন্দ ভাগবত বিরচিত একখানি পাঁচালী আছে, সেখানি চৈতন্যদেবের প্রায় সমসাময়িক।

ফরিদপুর জেলার বাটীকামারী গ্রামে আস্তত্ত ভুজঙ্গপ্রয়াত ও তোটক ছন্দে বিরচিত একখানি পাচালী পাওয়া যায়। ইতঃপূর্ব্বে উহা রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত জেলার অন্তর্গত বঙ্গেশ্বরদী পোষ্ট অফিসের অধীন ভাটদীগ্রামে লেখকের বাড়ীতে হস্তলিখিত কীটদষ্ট প্রাচীন পুস্তকরাশির মধ্য হইতে কবি ভৈরবচন্দ্র ঘটক বিরচিত যে জীর্ণ পাচালীখানি সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই লইয়া আজ আমরা পাঠক-সমীপে উপস্থিত হইতেছি। পাচালীখানি বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় এবং পৃথক্‌ভাগে প্রকাশ করা নানা কারণে অসুবিধাজনক মনে হওয়ায় আলোচনার জন্য ইহা রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইল। কবির জীবনবৃত্তান্ত জানিবার উপায় নাই। এই ভারতে অতীত যুগে কত শত উজ্জ্বল রত্ন সমাজের অপরিজ্ঞাত কত কক্ষ উদ্ভাসিত করিয়া কালের কোলে আশ্রয় লইয়াছে, কে তাহার সন্ধান লয়? তত্ত্বান্বেষী প্রাচীন মনীষিগণ সত্যান্বেষণে নিজ নিজ জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের জন্য তাঁহাদের জীবন-নাটকের ঘটনাবলীর স্মৃতি উদ্দীপিত রাখিতে তাঁহারা বিশেষ প্রয়াসী হইতেন বলিয়া প্রতীতি হয় না। যদি কখনও কোন মহাত্মা প্রসিদ্ধ ঘটনা ভবিষ্যতের জন্য লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাও পুনঃ পুনঃ রাষ্ট্রবিপ্লব, অগ্নিদাহ, জলপ্লাবন ইত্যাদি কারণে অনন্ত কালের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। সর্ব্বসংহারক কালের প্রভাবে অধিকাংশ প্রাচীন গ্রন্থই দরিদ্রের পর্ণকুটীরে অযত্নে কীটদষ্ট, জল বায়ুদ্বারা বিনষ্ট, নদীর জলে নিক্ষিপ্ত বা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। সুতরাং বর্ত্তমান যুগের তত্ত্বানুসন্ধিৎসু সাধকগণের প্রত্নতত্ত্বরূপ সমুদ্র-মন্থনের ফলে কোনও কোনও স্থলে সন্দেহের গরল সমুদ্ভূত হইতেছে।

কবিবর ভারতচন্দ্র দুইখানি পাঁচালী রচনা করেন। অনেকের বিশ্বাস ছিল, কবিকেশরী

ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ পয়ার, ত্রিপদী প্রভৃতি ছন্দে অক্ষর সংখ্যার সাম্য, মাত্রাবিচারের রীতি বা যতিস্থাপন পদ্ধতির দিকে বিশেষ দৃষ্টিপাত করিতেন না। কবিবর ভারতচন্দ্রই প্রথমে এই সকল দোষনির্ম্মুক্ত কবিতা লিখিয়া কাব্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। কবি ভৈরবচন্দ্র ঘটক রচিত এই পুস্তক পাঠে সেই বিশ্বাস তিরোহিত হইবে। ভারতচন্দ্রের প্রথম পুস্তক সত্যপীরের পাঁচালী, তাহাতে সন আছে, এ পুস্তকেও শক আছে। পাঁচালীকর্ত্তা ভৈরবচন্দ্র ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ববর্ত্তী। নিম্নোক্ত শ্লোকটি হইতে রচয়িতার নাম, রচনার সময় এবং তিনি যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায়।

ভূদেব ভৈরবচন্দ্র কবি তুষ্টমন।
ষোলশত বাইশ শকে করিল রচন॥

বর্ত্তমান প্রচলিত ১৮৪০ শক হিসাবে গ্রন্থখানি ২১৮ বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে।

রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ১১১৯ সনে (১৬৩৪ শকে) জন্ম গ্রহণ করিয়া 'সনেরুদ্র চৌগুণা' ১১৩৪ সনে সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেন, আর ভৈরবচন্দ্র ১৬২২ শকে (১১০৭ সনে) ভারতচন্দ্রের পাঁচালীর ২৭ বৎসর পূর্ব্বে সমালোচ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সুতরাং এই নিয়মের আবিষ্কর্ত্তা একমাত্র ভারতচন্দ্রকে বলা যাইতে পারে না।

কবি ভৈরবচন্দ্র বিরচিত দুইশত বর্ষেরও প্রাচীন এই পাঁচালী খানার ভাষা সম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করা সম্ভবতঃ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। পুথিখানিতে 'য' ফলার প্রয়োগ অত্যধিক। অনেকে 'কয়্যা' প্রভৃতি দেখিয়া মনে করেন, সে সময়ে বাঙ্গালা ভাষায় প্রায় এই আকারের উচ্চারণ ছিল। প্রচলিত বর্ণমালা সংস্কৃত ভাষার সুবিধার জন্ম সৃষ্ট। এই বর্ণমালাদ্বারা পূর্ণ উচ্চারণ রক্ষা করিয়া সকল সংস্কৃত শব্দই লিখা যাইতে পারে; কিন্তু ইহা দ্বারা উচ্চারণ বজায় রাখিয়া সমগ্র বাঙ্গালা শব্দ লিখিতে পারা যায় না। উদাহরণস্বরূপ আমরা তাই, ভাই, খাই, ছাই, এই, নাই, রাই, বউ, কেউ, খেউ খেউ, দাউ দাউ ইত্যাদি বলিতে পারি। যাওয়া, খাওয়া ইত্যাদি উচ্চারণানুযায়ী বাণান করিবার জন্ম প্রাচীনগণ ওকারের পরে আকার দিয়া লিখিতেন। বর্ত্তমান কালের লেখকগণ 'য'তে আকার দিয়া লিখিতেছেন। বাঙ্গালা শব্দগুলি কিরূপে উচ্চারণানুযায়ী লিখা যাইতে পারে, সে বিষয়ে মনীষীদিগের চিন্তা আসিয়াছিল। সেই চিন্তার প্রণোদনে কেহ 'কৈরা' লিখিতেন কেহ বা 'র' এর পরে 'য' ফলা আকার দিয়া লিখিতেন। বর্ত্তমান কবি 'য' ফলার পক্ষপাতী ছিলেন, এইমাত্র বুঝা যায়। যাঁহারা প্রচলিত বর্ণমালাকে সংক্ষেপ করিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে আমরা সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করি, কমান দূরের কথা, বাঙ্গালায় অক্ষর সংখ্যা বাড়াইতে হইবে কি না, সে বিষয়ে যেন তাঁহারা একটু চিন্তা করেন।

কর্য্যা, ধর্য্যা, ফির্য্যা, পড়্যা, কয়্যা, হয়্যা, নিয়্যা, বিয়্যা, দিয়্যা, ধায়্যা, পায়্যা যায়্যা, খায়্যা, ভুল্যা, পাল্যা, চল্যা, গেল্যা, বল্যা, দেখ্যা, শুন্যা, কান্দ্যা, মার্যা, বুঝ্যা, ভাব্যা, সাজায়্যা, বাজায়্যা প্রভৃতি কতকগুলি একজাতীয় শব্দ বাদ দিলে পাঁচালী খানি অনেকাংশে আধুনিক

বলিয়া অনুমিত হইবে। অপরিচিত পল্লী কবির লেখনী হইতে এরূপ সরল কবিতাবলী বাহির হইয়াছে, ইহা কি বিশেষ প্রশংসার কথা নহে? প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বের গুপ্ত কবি ঈশ্বর গুপ্তের লেখনী, যে অনুপ্রাসের ঝঙ্কারে বঙ্গদেশকে মুগ্ধ করিয়াছিল, দুই শতাব্দীর প্রাচীন এই পল্লী-কবির লেখনীতেও তাহার কিরূপ আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে, নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় পঙ্‌ক্তি হইতে তাহা সুস্পষ্ট অনুভূত হইবে।

"স্থল চলাচল, অনিল অনল, তুমি সর্ব্বরূপধারী।
তুমি সুখ দুঃখ, তুমি ভোগ মোক্ষ, তুমি পাপ-তাপহারী॥
"বদন তাহার, বিধুর আকার, লোচন খঞ্জন জিনি।
জিত তারাগণ, শোভিত দশন, তনু যেন সৌদামিনী॥"
"উপার্জ্জন করি ধন প্রাণপণ করি।
হরি হরি দুঃখে মরি কেবা নিল হরি॥"
"শিরীষ কুসুম সম কোমল শরীর;
জ্বালায় অবলাবালা হইল অস্থির॥
বিগলিত সুকাল কুন্তলভার তার।
সৌদামিনী ঘনে যেন করয়ে বিহার॥'
"ঝর্ ঝর্ তাহার নেত্রের বারি ঝরে।
আকার সুধার ধারা যেন সুধাকরে॥"
"বিনা দোষে অবশেষে বিদেশে প্রমাদ।"
"চোরের তালাসে রোষে আশে পাশে যায়।"
"নিশানাশে আকাশে প্রকাশে দিবাকর।"
"যে দেব প্রভাবে ভবে বিভব অপার।"
"কপটে তটিনী তটে রহিল বসিয়া॥" ইত্যাদি

কবি ভৈরবচন্দ্র সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনায় সম্পূর্ণভাবে মূলের অনুসরণ করেন নাই। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সাধু ও তাহার জামাতার নাম মূলে নাই; কবি তাহাদের সদানন্দ, শঙ্খপতি ও লক্ষপতি নাম দিয়াছেন। মূলে বণিকপত্নীর নাম লীলাবতী ও কন্যার নাম কলাবতী; কিন্তু কবি পত্নীর কলাবতী ও কন্যার লীলাবতী নাম দিয়া ঠিক বিপরীত করিয়াছেন। মূলের বংশধ্বজোপাখ্যান পাঁচালীতে নাই।

সাধারণতঃ প্রাচীন পুথিতে যথেষ্ট বর্ণাশুদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। অষ্টম ভাগ তৃতীয় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল মহাশয় একখানি সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রকাশ করেন। উহার বাণান সম্বন্ধে পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "প্রাচীন পুঁথির এইরূপ সকল বানানকে বর্ণাশুদ্ধি বিবেচনা করা সঙ্গত নহে, তৎকালে বানানের

প্রচলিত নিয়মই ঐরূপ ছিল। প্রাচীন পুঁথি সংগ্রাহকেরা ঐরূপ প্রাচীন নিয়মানুযায়ী বানানে হস্তক্ষেপ না করিলেই ভাল হয়।"

রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" পুস্তকে (৩য় সংস্করণ ৫৩ পৃঃ টীকা) লিখিয়াছেন—"আমরা উদ্ধৃত অংশের অনেক স্থলেই বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিব না। প্রথমতঃ প্রাকৃতের সঙ্গে বঙ্গভাষার নৈকট্য দেখাইতে মূল হাতের লেখা অবিকৃত রাখা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ উদ্ধৃতকারীর প্রাচীন রচনার সংস্কার করিবার অধিকার আছে কি না, তাহা সন্দেহ স্থল। যাহা আমরা ভ্রম বিবেচনা করিয়া সংশোধন করিতে প্রয়াসী, তাহাই হয়ত ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার একমাত্র পন্থা,—শুদ্ধ করিতে গেলে সেই পথ রুদ্ধ হয়।"

প্রাচীন পুথিতে যেরূপ বাণান আছে, তাহাই শুদ্ধ বলিয়া মানিতে হইবে কেন, তাহার কারণ বুঝি না। লিপিকরগণের জ্ঞান ও উচ্চারণানুসারে বাণান বিকৃত হওয়া অসম্ভব নহে। অনুলিপির অনুলিপি হওয়ায় অনেক প্রাচীন গ্রন্থে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপে লিখিত হইয়াছে। ত্রয়োদশভাগ ২য় সংখ্যা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় শ্রীযুক্ত জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় কর্তৃক প্রকাশিত "শুর্য্যের পাঞ্চালী" এবং বিংশ ভাগ ২য় সংখ্যা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত "অদ্ধেশ্বরী ব্রত-পাঞ্চালী" পাঠ করিলেই ইহার সত্যতার উপলব্ধি হইবে। শুর্য্যের পাঞ্চালীতে শুর্য্য, সুর্য্য, শুর্জ্জ্য, স্বর্য্য, এই চারিপ্রকার বাণান লিখিত হইয়াছে; ইহার কোন্‌টি শুদ্ধ? স্বরস্বতী স্থলে 'শরস্বতি' ও 'পীড়িত' স্থলে 'পিরিত' প্রভৃতি এবং "অদ্ধেশ্বরী ব্রত-পাঞ্চালীতে" সরশ্বতির পাদপর্দ্দে, মিত্যু, অর্ম্ম, সোম্‌কুম্ভ প্রভৃতি অনেক অদ্ভুত রকমের বাণান আছে। অনেক হস্তলিখিত সংস্কৃত পুথিতেও বর্ণাশুদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। এ গুলিও কি শুদ্ধ বলিতে হইবে? একটি শব্দের একপ্রকার বাণানই বাঞ্ছনীয়। প্রাচীন পুথির বাণান ঠিক রাখিলে তাহা যে কিরূপ অপাঠ্য হয় তাহা ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত "দুর্গামঙ্গলের" পরিশিষ্ট দেখিলেই বুঝা যাইবে। উহার আরম্ভ এইরূপ—

নারায়নং নমস্কৃতং নরঞ্চৈব নরত্তমং।
দেবি সরস্বোতি চৈব ততো জয়মুদিরয়েৎ॥ ইত্যাদি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত ধর্ম্মমঙ্গলে 'শাকে ঋতু' স্থলে 'সাকেরিত' এবং পুস্তকের শেষে এই শ্লোকটি মুদ্রিত হইয়াছে;—

কুম্ভে মাসে কৃষ্ণেপক্ষে প্রতিপদি তিথোত্তরা।
ভূম্যাত্ম দিয়ন বারে লিখিতা পুস্তিকা ময়া॥

এইরূপ অশুদ্ধ বাণানের পরিবর্ত্তন করা সঙ্গত কি না তাহা সুধীগণের বিবেচ্য। আহ্লাদের বিষয়, আলোচ্য পাঁচালীখানিতে বেশী বর্ণাশুদ্ধি নাই। দুই একস্থল লিপিকর প্রমাদ বলিয়া মনে হওয়ায় সংশোধন করিয়াছি।

কবি তাঁহার পাঁচালীতে যে সকল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও উহার কোনও কোনও শব্দের অর্থনির্ণয় করিতে পারি নাই। যথা—নিখর, খোল প্রভৃতি।

সারঙ্গ, প্রসিত, গ্রামণী, নিশামুখ প্রভৃতি শব্দ দেখিয়া তাঁহার সংস্কৃতে অভিজ্ঞতা এবং অভিধান জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙ্গালার পণ্যসম্ভার তৎকালে কত সমৃদ্ধ ছিল, তাহা কবির লেখনী প্রসূত শঙ্খপতি সদাগরের পণ্যদ্রব্যের তালিকা হইতে জানিতে পারা যায়। পাঁচালীখানা আমূল প্রকাশিত হইল বলিয়া এখানে আর পৃথক্‌ভাবে ঐ তালিকা প্রদত্ত হইল না।

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র ঘোষাল।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রঙ্গপুর-শাখার নিয়মাবলী

১। উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রত্নতত্ব, প্রাদেশিক ভাষাতত্ব, কৃষি-শিল্পতত্ব, সম্ভ্রান্তবংশীয়গণের ইতিবৃত্ত, প্রাচীন অপ্রকাশিত দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পুঁথিগুলির উদ্ধার এবং কবিগণের বিবরণ-সংগ্রহ, প্রাচীন কীর্ত্তি রক্ষা ও বিবিধ উপায়ে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নতি সাধনার্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, রঙ্গপুর-শাখা স্থাপিত হইয়াছে।

২। যে সকল মহানুভব ব্যক্তি এই সভার স্থায়ী ধনভাণ্ডারে এককালীন পাঁচশত বা তদূর্দ্ধ পরিমিত অর্থ দান করিবেন, তাঁহারা সভার আজীবন সদস্য ও পরিপোষকরূপে পরিগণিত হইবেন

৩। বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই এই সভার সাধারণ সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে পারেন। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ। যথারীতি নির্ব্বাচনের পর সম্পাদক নির্ব্বাচিত ব্যক্তির নিকটে তৎসংবাদসহ একখানি "সদস্যপদ-স্বীকারপত্র" স্বাক্ষর জন্য পাঠাইয়া দিবেন। নির্ব্বাচনের তারিখ হইতে এক মাস মধ্যে ঐ সদস্যপদ স্বীকারপত্রের শূন্য অংশগুলি পূর্ণ করিয়া ১৲ টাকা প্রবেশিকা (রঙ্গপুরবাসী উভয় সভার সদস্যের পক্ষে) বা চারি মাসের অগ্রিম চাঁদা ন্যূনকল্পে ১৲ টাকা (কেবল শাখা-সভার সদস্যের পক্ষে) সম্পাদকের নিকটে পাঠাইলে তাঁহাকে সদস্যশ্রেণীভুক্ত করা হইবে।

৪। মূল ও শাখা-পরিষদের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ উভয় সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ॥০ আনা এবং শাখা-পরিষদের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ কেবল শাখা-সভার সদস্যকে মাসিক অন্যূন ।০ আনা চাঁদা দিতে হয়। অধিক হইলে আপত্তি নাই, সাদরে গৃহীত হইবে। উভয় সভার সদস্যগণ মূল ও শাখা উভয় সভার যাবতীয় অধিকারসহ প্রকাশিত পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। কেবল শাখা-সভার সদস্যগণ শাখা-সভার যাবতীয় অধিকারসহ পত্রিকাদি বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইবেন। শাখা-সভার সংগৃহীত যাবতীয় গ্রন্থ ও পত্রিকাদি পাঠের অধিকার উভয় প্রকারের সদস্যগণেরই থাকিবে।

৫। এতদ্ব্যতীত যাঁহারা সাহিত্যসেবায় ব্রতী থাকিয়া বিশেষভাবে শাখা-পরিষদের উপকার করিবেন, তাঁহারা চাঁদা দিতে অক্ষম হইলেও, এই সভার অধ্যাপক বা সহায়ক সদস্যরূপে নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন। এরূপ সদস্যকে সভার উদ্দেশ্য সম্পূরণ জন্য কোনও না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে হইবে। নির্ব্বাচনের প্রণালী মূল সভার অনুরূপ।

৬। সদরের সদস্যগণের নিকট তাঁহাদের ইচ্ছাক্রমে মাস মাস বা বর্ষ-মধ্য ও শেষভাগে চাঁদার খাতা পাঠাইয়া দিয়া চাঁদার টাকা গৃহীত হয়। মফঃস্বলের সদস্যদিগের নিকট বর্ষ-মধ্য ও শেষভাগে ভি, পি, যোগে পত্রিকাদি পাঠাইয়া চাঁদার টাকা লওয়া হয়। এইরূপে বৎসরের চাঁদা বৎসরের মধ্যে শোধ করিয়া না দিলে কেহ পত্রিকাদি প্রাপ্তির দাবী করিতে পারিবেন না। উভয় সভার সদস্যের দেয় অন্যূন ॥০ চাঁদার অর্দ্ধাংশ মূল সভা এবং অপরার্দ্ধাংশ শাখা-সভা স্ব স্ব পত্রিকাদি উক্ত প্রকারে ভি, পি, যোগে প্রেরণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিবেন। মূল সভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি মূল সভা এবং শাখাসভা হইতে প্রকাশিত পত্রিকা ও গ্রন্থাদি শাখা-সভা স্ব স্ব ব্যয়ে বিতরণ করিবেন।

৭। কেবল রঙ্গপুরবাসীর একত্রে মূল ও শাখা উভয় সভার সদস্যপদ গ্রহণের অধিকার আছে। যে সকল সদস্য ১৩২০ সালের পূর্ব্বে উভয় সভার অধিকার পাইয়াছেন, তাঁহারা রঙ্গপুরের অধিবাসী না হইলেও তাঁহাদের উভয় সভার অধিকারাদি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।

৮। রঙ্গপুর শাখা-পরিষদের অন্যান্য যাবতীয় নিয়ম মূল সভার অনুরূপ।

সভা-সম্পর্কীয় টাকা ও বিনিময়পত্রাদি নিম্নোক্ত ঠিকানায় সভার সম্পাদকের নামে পাঠাইতে হইবে।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-কার্য্যালয়, রঙ্গপুর। শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায়চৌধুরী, সম্পাদক।

সাহিত্য সেবকগণের শুভ সুযোগ !

রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ হইতে প্রকাশিত

(১) অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ ; (২) চণ্ডিকাবিজয় ; (৩) আহ্নিকাচার তত্ত্বাবশিষ্ট (৪) নিমাই চরিত ; (৫) সত্যনারায়ণের পাঁচালী ; (৬) কর্পূরস্তব, অনুমান ১১০০ এগার শত পৃষ্ঠার এই ছয়খানি পুস্তক তিন টাকারস্থলে এক টাকায় বিক্রয় করা হইতেছে। যাঁহারা সম্পূর্ণ সেট ক্রয় করিতে অনিচ্ছুক, তাঁহাদিগকে প্রত্যেক গ্রন্থের জন্য অর্দ্ধমূল্য প্রদান করিতে হইবে। যাঁহারা অন্ততঃ একসেট গ্রন্থ ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগকে ামরূপ, গৌরীপুর, মালদহ, পাবনা ও রাজসাহী অধিবেশনের দেড় সহস্রাধিক পৃষ্ঠার সচিত্র কার্য্যবিবরণ ও সম্মিলনে পঠিত প্রবন্ধাবলী সমন্বিত গ্রন্থরাজি প্রয়োজনীয় ডাক মশুল ও প্যাকিং মাত্র লইয়া প্রদান করা হইবে। বলা বাহুল্য সর্ব্বপ্রকার পুস্তকেরই ডাক মাশুল গ্রাহকের দেয়। গ্রন্থের সংখ্যা অধিক হইলে রেলওয়ে যোগে পুস্তক গ্রহণ করা সুবিধাজনক। পূর্ব্বোক্ত পূর্ণ সেট গ্রন্থ ক্রেতৃদিগকে রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার পুরাতন খণ্ডগুলি ৩৲ তিনটাকা স্থলে এক টাকায় প্রদান করা হইবে। অন্যথা অর্দ্ধ মূল্য প্রদান করিতে হইবে। রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষদের সম্পাদক মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে গ্রন্থাদি প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ কার্য্যালয়
রঙ্গপুর।

শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী
সম্পাদক

নিবেদন

কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি এবং প্রেসের অসুবিধার এবং অর্থাভাবে রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত হইতে পারে নাই। পরিষদের সদস্যদিগের চেষ্টায় রঙ্গপুরে শুভ নববর্ষের প্রারম্ভে একটি বৃহৎ প্রেস প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে। ঐ প্রেস প্রতিষ্ঠিত হইলে এই পত্রিকা অতঃপর নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত করা সম্ভবপর হইবে। ইতি—

সম্পাদক।